বঙ্কিম-প্রতিভা

বঙ্কিম-প্রতিভা

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ
সম্পাদিত

প্রাপ্তিস্থান :—
রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো,
কলিকাতা

প্রকাশক ঃ—
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
পাইকপাড়া রাজবাটি
কলিকাতা

মূল্য তিন টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো,
কলিকাতা হইতে
শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক মুদ্রিত

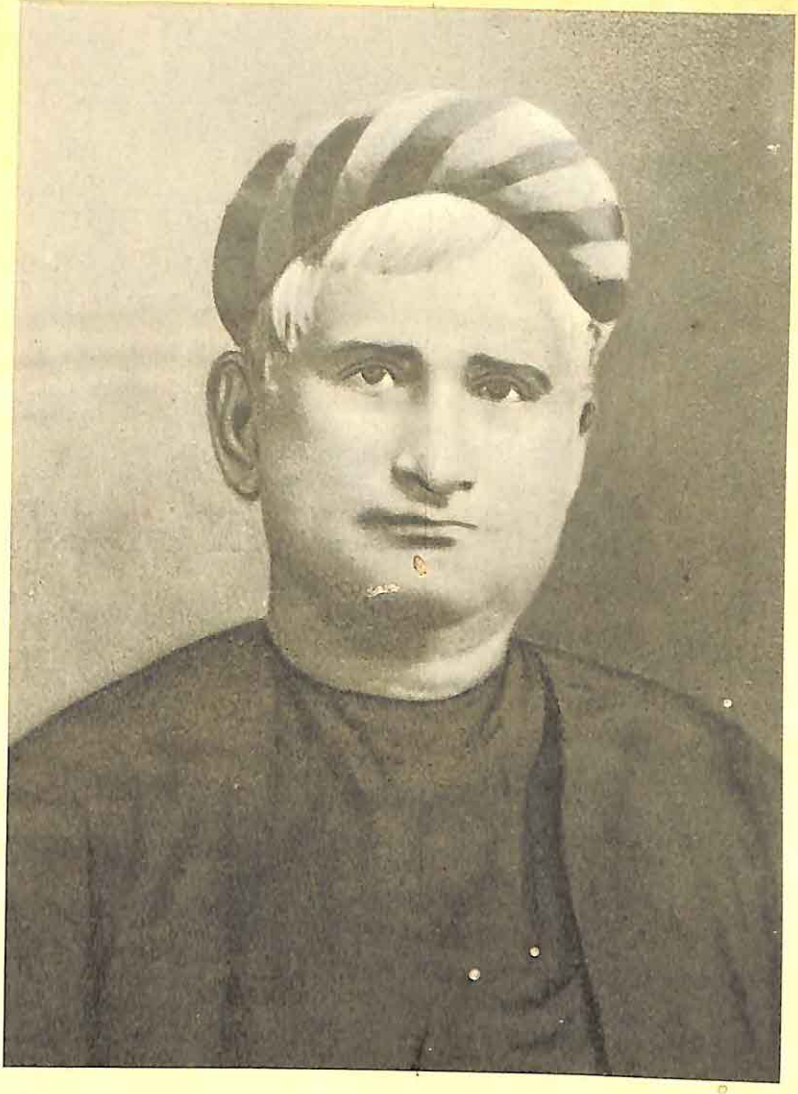
ভূমিকা

এই ১৩৪৫ সাল বাঙালীর পক্ষে একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর বাঙালী হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র—এই তিনটি বাঙালী মহাপুরুষের জন্মশতবার্ষিক উৎসব করিয়াছে ও করিবে। তাহার মধ্যে হেমচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের স্মরণোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে, কেশবচন্দ্রের এখনও হয় নাই।

বঙ্কিম শতবার্ষিকী উপলক্ষে দেশব্যাপী যে সাড়া পড়িয়াছিল, তাহারই পূর্ব্বাভাসস্বরূপ 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে উৎসুক হইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি পরমশ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম; এবং তাঁহারই পরামর্শে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু-তিথিতে যে উৎসব প্রতিবৎসর পরিষদ্-ভবনে হয়, সে উৎসব এবৎসর সাহিত্য-পরিষৎ আমাদের গৃহে অনুষ্ঠান করিতে মনস্থ করিয়া আমাদের অনুগৃহীত করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে গত ৮ই এপ্রিল তারিখে সম্মিলিত উদ্যোগে এখানে বঙ্কিম-উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। সেই উপলক্ষে যে যে প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল তাহার কয়েকটি ও অন্য আরও কয়েকটি প্রবন্ধ লইয়া এই স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হইল। ইহা ছাড়া ঐ অনুষ্ঠান উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের কতকগুলি অপ্রকাশিত ইংরেজী রচনার পাণ্ডুলিপি প্রদর্শিত হয়। তাহার মধ্যে আমার পিতামহদেবের শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় তাঁহার নিকট হইতে প্রদর্শনীর জন্য নীত রচনাগুলি প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে *Letters on Hinduism* ও *Debi Chowdhurani*র ইংরেজী অনুবাদ দুইটি সেই অনুসারে প্রকাশিত হইল। দুইটি রচনা একখানি খাতারই দুইদিকে লেখা। শুনিয়াছি *Letters on Hinduism* পজিটিভিস্ট যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষকে লেখা এবং ইংরেজী অনুবাদটি সেকালের ছোটলাট স্যর চার্লস ইলিয়টের জন্য করা। এ সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন এখনও রহিয়াছে বলিয়াই মনে করি।

এই ইংরাজী অংশ দুইটি পাণ্ডুলিপিতে ঠিক যে প্রকার পাওয়া গিয়াছে সেই প্রকারই ছাপা হইয়াছে। পাণ্ডুলিপি হইতে মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র লিখিবার পর ইহা সংশোধন করেন নাই। গ্রন্থ যে শুধু অসম্পূর্ণ রহিয়াছে তাহা নয়, স্থানে স্থানে কোন কোন কথা পড়িয়া গিয়াছে, অর্থের সঙ্গতির জন্য তাহা বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইল। তাঁহার পত্রগুলির ক্রমিক সংখ্যা হইতেও এই কথাই মনে হয়। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও অংশ দুইটির মধ্যে কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিয়া গেল, সেজন্য পাঠকের নিকট আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

এই গ্রন্থ সম্পাদনায় যাঁহাদের নিকট সাহায্য পাইয়াছি, তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম



বঙ্কিমচন্দ্র

ENGRAVED & PRINTED BY
THE BENGAL AUTOTYPE CO., CAL

বঙ্কিমচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যাত্রীর মশাল চাই রাত্রির তিমির হানিবারে,
সুপ্তিশয্যাপার্শ্বে দীপ বাতাসে নিভিছে বারে বারে।
কালের নির্মম বেগ স্থবির কীর্তিরে চলে নাশি',
নিশ্চলের আবর্জনা নিশ্চিহ্ন কোথায় যায় ভাসি'।
যাহার শক্তিতে আছে অনাগত যুগের পাথেয়
সৃষ্টির যাত্রায় সেই দিতে পারে আপনার দেয়।
তাই স্বদেশের তরে তারি লাগি উঠিছে প্রার্থনা
ভাগ্যের যা মুষ্টিভিক্ষা নহে, নহে জীর্ণ শস্যকণা
অঙ্কুর ওঠে না যার, দিনান্তের অবজ্ঞার দান
আরম্ভেই যার অবসান।

সে প্রার্থনা পূরায়েছ, হে বঙ্কিম, কালের যে বর
এনেছ আপন হাতে নহে তাহা নির্জীব স্থাবর।
নবযুগসাহিত্যের উৎস উঠি' মন্ত্রস্পর্শে তব
চিরচলমান স্রোতে জাগাইছে প্রাণ অভিনব
এ বঙ্গের চিত্তক্ষেত্রে, চলিতেছে সম্মুখের টানে
নিত্য নব প্রত্যাশায় ফলবান ভবিষ্যৎ পানে।
তাই ধ্বনিতেছে আজি সে বাণীর তরঙ্গ কল্লোলে,
বঙ্কিম, তোমার নাম, তব কীর্তি সেই স্রোতে দোলে।
বঙ্গভারতীর সাথে মিলায়ে তোমার আয়ু গণি,
তাই তব করি জয়ধ্বনি।

স্মৃতিপূজা

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

বঙ্কিম ভারতের নব জাতীয়তার ঋষি; বাঙালীর কৃষ্টি ও প্রসারের অগ্রদূত। বাংলা সাহিত্যে ও সমাজজীবনে বঙ্কিম যে আলোকপাত করিয়াছিলেন তাহার জ্যোতিঃ আজও আমাদের পথ দেখাইতেছে। তাঁহার স্মৃতি-উৎসব বাঙালীর জাতীয় কর্ত্তব্য।

বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

২৬এ চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুতিথি। ইং ১৮৯৪, ৮ই এপ্রিল বঙ্কিমচন্দ্র ৫৬ বৎসর বয়সে ইহলোক হইতে তিরোধান করেন। ঐ দিনকে তাঁহার মৃত্যুদিন না বলিয়া বৈষ্ণবী ভাষায় 'বিজয়-বাসর' বলিতে চাই। যিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মত যুগপ্রবর্তক পুরুষ—তিনি কালজয়ী, মৃত্যুঞ্জয়—তিনি অজর অমর হইয়া কল্পকাল যশঃশরীরে অবস্থান করেন—তাঁহার আবার মৃত্যু কি ?

সর্বহর কাল তাঁরে না পারে হরিতে
বিজয় লুটায় পদে জেতারে বরিতে।

বঙ্কিমচন্দ্র ঐরূপই জেতা ছিলেন—তিনি সাহিত্যরথীদিগের রথীতম—অপরাজিত জেতা—রথীনাং ত্বা রথীতমং জেতারম্ অপরাজিতম্।

বঙ্কিমচন্দ্র যেদিন জন্মগ্রহণ করেন (১৮৩৮, ২৬এ জুন ; বঙ্গাব্দ ১২৪৫, ১৩ই আষাঢ়) সাহিত্য-পঞ্জীতে সেটি স্মরণীয় দিন—ঐ দিন আকাশে কিন্নর-গন্ধর্বেরা নিশ্চয়ই দুন্দুভিধ্বনি করিয়াছিল—দেববালারা অলক্ষ্যে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিল—স্বর্গে মহোৎসব নিষ্পন্ন হইয়াছিল।

তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভার পরিমাপ করিতে পারি, এমন যোগ্যতা আমার নাই। তিনি কেবল তো উপন্যাস-রাজ্যের অধিরাজ ছিলেন না—তিনি বঙ্গ সাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাট্। নবীনচন্দ্রের ভাষার অপপ্রয়োগ করিয়া কেহ কেহ ইদানীং বলিতেছেন বটে—

"এক রাজা যাবে পুনঃ অন্য রাজা হবে
সাহিত্যের সিংহাসন শূন্য নাহি রবে।"

এ কথা কিন্তু ঠিক নয়—আমার বিশ্বাস, বঙ্কিমের রাজাসন চিরকাল শূন্যই থাকিবে এবং পরবর্তীগণ সেই শূন্য সিংহাসনের উপর ছত্র ধারণ করিয়া রামচন্দ্রের আদর্শ ভ্রাতা অমিতকীর্তি ভরতের মত আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিবেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভা নানা খাতে প্রবাহিত হইয়া বাংলা সাহিত্যকে পীন ও পুষ্ট করিয়াছিল। তিনি 'বঙ্গদর্শনে'র দ্বারা সর্বাঙ্গসম্পন্ন সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করিতেন।

তাঁহার ঐ প্রচেষ্টা যে অনেকাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, একথা অসংকোচে বলা যায়। এ সম্পর্কে তাঁহার নিজের কথা এই—

"যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়া দিলে অগম্য কানন বা প্রান্তর মধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্য-সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম।"

এখানে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের বিবিধ ক্ষেত্রে নিজের 'মজুরদারি'র উল্লেখ করিলেন—ইহা বিনয়ের পরাকাষ্ঠা বটে, কিন্তু এ আত্মগ্লানি অনাবশ্যক। প্রকৃত কথা এই, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বহুমুখী ছিল—সেই জন্য তিনি একাধারে কবি, শিল্পী, সমালোচক, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, দার্শনিক, সামাজিক ও ধর্মবেত্তা ছিলেন।

১২৭১ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৬৫) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়। ইহাই তাঁহার প্রথম বাংলা মুদ্রিত রচনা। তৎপূর্বে তিনি তাঁহার ইংরেজী নভেল *Rajmohon's Wife*—'Indian Field' নামক সাপ্তাহিকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখনও এদেশে ইংরেজের একাধিপত্য—আকাশে বাতাসে পাশ্চাত্য ভাবের অবিরত ক্ষরণ। সাধে কি শিক্ষিতের প্রতিভূ হইয়া নিমচাঁদ বলিয়াছিলেন—'I dream in English'। কিন্তু শীঘ্রই বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ মোহ কাটিয়া যায়। তিনিও বোধ হয় স্বর্গত মধুসূদনের মত বলিয়াছিলেন—

"হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন—
তা' সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি'
পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি"

এবং প্রতিক্রিয়ার পূর্ণ আবেগে 'বঙ্গদর্শনে'র অনুষ্ঠানপত্রে লিখিয়াছিলেন—"আমরা যত ইংরাজী পড়ি, যত ইংরাজী কহি বা যত ইংরাজী লিখি না কেন, ইংরাজী কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্ম স্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময় ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না।"

ইহার পরও দেখি বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজীর প্রতি অযথা পক্ষপাত জন্য বাঙ্গালীকে তীব্র তিরস্কার করিতেছেন—

"আজিও নাকি কলিকাতায় এমন অনেক কৃতবিদ্য নরাধম আছে, যাহারা মাতৃভাষাকে ঘৃণা করে,—যে তাহার অনুশীলন করে, তাহাকেও ঘৃণা করে, এবং আপনাকে মাতৃভাষা-অনুশীলনে পরাঙ্মুখ ইংরেজীনবিশ বলিয়া পরিচয় দিয়া আপনার গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা পায়।"

ঐ 'দুর্গেশনন্দিনী' সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহভাজন বন্ধু রমেশচন্দ্র ১৩০১ সনের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়' এইরূপ লিখিয়াছেন—

"যখন 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইল, তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটি নূতন আলোকের বিকাশ হইল। দেশের লোক সে আলোকচ্ছটায় চমকিত হইল, সে বালার্ক কিরণে প্রফুল্ল হইল, সে দীপ্তিতে স্নাত হইয়া স্তুতিগান করিল। কলিকাতা ও ঢাকা, এবং পশ্চিম ও পূর্বদেশ হইতে আনন্দরব উত্থিত হইল, বঙ্গবাসিগণ বুঝিল সাহিত্যে একটি নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে, একটি নূতন ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে, একটি নূতন চিন্তা ও নূতন কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে।"

ইহার পর ১৮৬৬ সালে 'কপালকুণ্ডলা' ও ১৮৬৯ সালে 'মৃণালিনী' প্রকাশিত হইল। তখন বাঙ্গালী পাঠকের ঐ চমক স্থায়ী বিস্ময়ের আকার ধারণ করিল। 'কপালকুণ্ডলা' সম্বন্ধে সুবিজ্ঞ সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন—

"এমন অছিদ্র, উজ্জ্বল, বাচালতাশূন্য অথচ রসপরিপূর্ণ, হিন্দুভাবে অস্থিমজ্জায় গঠিত, অদৃষ্টবাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখায় ওতপ্রোত কাব্যগ্রন্থ বাংলায় নাই।"

'মৃণালিনী'র কথা বিশেষ কিছু বলিব না, তবে 'গিরিজায়া' ও 'দিগ্‌বিজয়' এবং দেশদ্রোহী 'পশুপতি'র অন্তিমের মর্মভেদী আত্মগ্লানি বাঙ্গালী পাঠক কোন দিন ভুলিতে পারিবে না।

ইহার পর ইংরেজী ১৮৭২, শুভ ১লা বৈশাখ, ১২৭৯ সালে 'বঙ্গদর্শনে'র প্রকাশ। 'বঙ্গদর্শন' বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্র নয় বটে, কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, 'বঙ্গদর্শনে'র পূর্বে কোন বাংলা মাসিক শিক্ষিত সমাজের চিত্তহরণ করিতে পারে নাই। চারি বৎসর মাত্র বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদকতা করিয়াছিলেন—ঐ বর্ষচতুষ্টয় বঙ্গীয় সাময়িক সাহিত্যের সুবর্ণযুগ।

'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম সংখ্যা হইতে ধারাবাহিকভাবে 'বিষবৃক্ষ' প্রকাশিত হয়। 'বিষবৃক্ষ' অপূর্ব উপন্যাস। যখন ঐ উপন্যাস ইংরেজীতে অনূদিত হইয়া বিলাতে প্রথম পরিচিত হইল, তখন একখানি ইংরেজী সংবাদপত্র (Scotsman) বলিয়াছিলেন—এ গ্রন্থ সংস্কৃত Epic কাব্যের Episode-গুলির সহিত তুলনীয়। আর একজন বলিয়াছিলেন—Sophocles-প্রণীত Antigone চরিত্রের পর আর ইহার তুল্য স্ত্রীচরিত্র কোন সাহিত্যে সৃষ্ট হয় নাই।

ইং ১৮৬৫-তে 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের সহিত যদি বঙ্কিম-যুগের আরম্ভ ধরা যায়, তবে ১৮৯৪-তে তাঁহার তিরোধানের সহিত ঐ যুগের অবসান। তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স মাত্র ৫৬ বৎসর। তাঁহার প্রতিভাস্রোতে তখনও ভাঁটা আরম্ভ হয় নাই। ঐ ৩০ বৎসরের মধ্যে শেষ দশ বৎসর বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষভাবে ধর্মালোচনায় মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার

'দেবীচৌধুরাণী', 'সীতারাম'—বিশেষতঃ 'ধর্মতত্ত্ব (অনুশীলন)', 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'গীতাভাষ্য' ঐ সময়ের রচনা।

'দেবীচৌধুরাণী'র ঠিক পূর্ববর্তী 'আনন্দমঠ'—বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশানুরাগের মহোজ্জ্বল মূর্তি। তৎপূর্বে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'ভারত কলঙ্ক' প্রভৃতি বিবিধ ঐতিহাসিক প্রবন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় দেশপ্রীতির নিদর্শন পাইয়াছিলাম—বিশেষতঃ কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসবে' যোগদান করিয়া মাতৃভক্তিতে উদ্বেলিত হইয়াছিলাম। সে দুর্গোৎসব মনে পড়ে কি? কমলাকান্ত সপ্তমী পূজার দিন একটু অধিকমাত্রায় আফিম চড়াইয়াছেন এবং কুহক-স্বপ্ন দেখিতেছেন। দেখিতেছেন—কালের স্রোতঃ দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিয়াছে, আর তিনি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছেন—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—'মা! মা!' করিয়া ডাকিতেছেন, 'কোথা মা! কই আমার মা!'

"সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে! এই কি মা? হাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃণ্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্ন-ভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশ ভুজ—দশ দিক্—দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রুনিষ্পীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না—কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু এক দিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণপ্রহারিণী, শত্রুমর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী,—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা!"

"কোথায় ফুল পাইলাম, বলিতে পারি না—কিন্তু সেই প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম—ডাকিলাম, 'সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে, শিবে, আমার সর্বার্থসাধিকে! অসংখ্যসন্তানকুলপালিকে! ধর্ম, অর্থ, সুখ, দুঃখদায়িকে! আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর। এই ভক্তি প্রীতি বৃত্তি শক্তি করে লইয়া তোমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি, তুমি এই অনন্তজলমণ্ডল ত্যাগ কারিয়া এই বিশ্ববিমোহিনী মূর্তি একবার জগৎসমীপে প্রকাশ কর। এসো মা! নবরাগরঙ্গিণি নববলধারিণি, নবদর্পে দর্পিণি, নবস্বপ্নদর্শিনি! এসো মা, গৃহে এসো—ছয় কোটি সন্তানে একত্রে, এক কালে, দ্বাদশ কোটি কর যোড় করিয়া, তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয় কোটি মুখে ডাকিব, মা প্রসূতি অম্বিকে! ধাত্রি ধরিত্রি ধনধান্যদায়িকে! নগাঙ্কশোভিনি নগেন্দ্রবালিকে! শরৎসুন্দরি চারুপূর্ণচন্দ্রভালিকে! ডাকিব,—সিন্ধু-সেবিতে সিন্ধু-পূজিতে,

সিন্ধু-মথনকারিণি ! শত্রুবধে দশভুজে দশপ্রহরণধারিণি ! অনন্তশ্রী অনন্তকালস্থায়িনি ! শক্তি দাও সন্তানে, অনন্তশক্তিপ্রদায়িনি !”

'আনন্দমঠে'র আদ্যোপান্ত এই ঝঙ্কারে মুখরিত—এই সুষমায় মণ্ডিত। আর 'আনন্দমঠে'র প্রধান চরিত্র—সত্যানন্দ, জীবানন্দ, শান্তি ? এমন দেশপ্রাণ সেবক-সেবিকা —বাংলার জাতীয় জীবনের নির্মাতা বঙ্কিমচন্দ্র ভিন্ন কে চিত্রিত করিতে পারিত ? তাই 'আনন্দমঠে'র শেষে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—“হায় ! আবার আসিবে কি মা ! জীবানন্দের ন্যায় পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা আবার গর্ভে ধরিবে কি মা !”

আর 'আনন্দমঠে'র প্রাণস্বরূপ আমাদের জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম্' ? যাঁহার হৃদয়কন্দর হইতে এই মন্দাকিনী-ধারা উৎসারিত হইয়াছিল—যিনি দেশবাসীকে অমোঘ 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন,—আমি বলিতে চাই—তিনি যদি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি না হন, তবে ঋষি কে ?

প্রাচীন ভারতের মহীয়সী কীর্তির প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের যে সাগ্রহ দৃষ্টিপাত ছিল, তাহাও ঐ স্বাজাত্যবোধের ফল। উড়িষ্যার প্রস্তর-শিল্পে বিমুগ্ধ হইয়া তিনি 'সীতারামে' লিখিতেছেন—

“পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মত হিন্দু ? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়া ছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু ? আর এই প্রস্তর মূর্তি সকল যে খোদিয়াছিল, তারা কি হিন্দু ? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল উপনিষৎ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক—এ সকলই হিন্দুর কীর্তি—এ পুতুল কোন্ ছার। তখন মনে করিলাম হিন্দুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।”

কিশোর বয়স হইতে দর্শনশাস্ত্রের প্রতি এ অক্ষমের অনুরাগ। শুনিয়াছি আমার কোনও কোনও বন্ধু বেদান্তকে আমার 'ব্যসন' বলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শতবার্ষিকীর সুযোগে তাঁহার দার্শনিক মতের একটু নিবিড়ভাবে আলোচনা ও সমালোচনা করিয়া আমি 'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র' নাম দিয়া একখানি গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। ঐ গ্রন্থের প্রথম চারি অধ্যায় লিখিত হইয়াছে—আরও আট অধ্যায় লিখিতে হইবে। আমার ইচ্ছা ছিল দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে এই সভায় আপনাদের সঙ্গে কিছু চিন্তা বিনিময় করি ; কিন্তু সময়াভাব, বিশেষতঃ আপনাদের ধৈর্যচ্যুতির আশঙ্কা। সেই জন্য সংক্ষেপে একটি মাত্র প্রসঙ্গের কিঞ্চিৎ অবতারণা করিব।

ধর্ম ও দর্শনের এক প্রধান সমস্যা অবতারবাদ। অশরীরী পরমেশ্বরের মনুষ্যশরীর ধারণ সম্ভব কি না ? এ দেশের কথা এই—শ্রীভগবান্ আশ্চর্যকর্মা—অরূপ হইয়াও বহুরূপ,—অরূপায়োরুরূপায় নমো হ্যাশ্চর্যকর্ম্মণে ! নিপট অদ্বৈতী শঙ্করাচার্যের ভাষায়

বলি—স্যাৎ পরমেশ্বরস্যাপি ইচ্ছাবশাৎ মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থম্ (১।১।২০ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য)।

বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' ঐ প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন—ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব ? উত্তরে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"যিনি ইচ্ছাময় ও সর্বশক্তিমান্, তিনি ইচ্ছা করিলে নিরাকার হইলেও আকার ধারণ করিতে পারেন না কেন ? তাঁহার সর্বশক্তিমত্তার এ সীমা নির্দেশ কর কেন ?" অবশ্য যাঁহার কটাক্ষমাত্রে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয় সাধিত হয়, কেবল একটা কংস বা শিশুপাল মারিবার জন্য যে তাঁহাকে ভূতলে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, (বঙ্কিমচন্দ্র বলেন) ইহা অসম্ভব কথা বটে। তবে অবতার কেন ?

পূর্ণ আদর্শ ভিন্ন প্রকৃত ধর্মসংস্থাপন সম্পন্ন করা অসম্ভব। জীবের সমক্ষে এই পূর্ণ আদর্শ প্রদর্শনের জন্যই অবতার স্বীকার করিয়া ভগবানের সান্ত ও সীমাবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের কথায় বলি—

"সম্পূর্ণ ধর্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। * * অতএব যদি ঈশ্বর স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্মের উন্নতি হইতে পারে। এই জন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন।" (কৃষ্ণচরিত্র)

বৈজ্ঞানিক-প্রবর স্যার অলিভার লজ্ ভগবানের অবতার গ্রহণের প্রয়োজন অন্যরূপে সিদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভগবানের ঐশ্বর্য এতই বিরাট্, তাঁহার প্রভাব এতই প্রকাণ্ড যে, তিনি যদি অবতাররূপে নিজেকে সঙ্কুচিত ও সংকীর্ণ না করে কেহ ইন, তবে তাঁহার অনাবৃত মুখ দর্শন করিতে পারে না। এই জন্যই খৃষ্টানেরা বলেন "No man can see My face and live।" দৃষ্টান্তস্বরূপ স্যার অলিভার লজ্ রবি ও রশ্মির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সূর্য সমস্ত পৃথিবীর প্রাণ—সূর্যরশ্মি দ্বারাই পৃথিবী পুষ্ট, বর্ধিত ও সঞ্জীবিত আছে ; কিন্তু কোনদিন যদি সূর্য নিজের প্রচণ্ড মার্তণ্ড মূর্তিতে প্রকটিত হয়েন, তাহার ফলে কি হয় ? সমস্ত পৃথিবী মুহূর্ত মধ্যে ভস্মীভূত হইয়া পরমাণুপুঞ্জে পরিণত হয়। সাগর, নদী, পর্বত, প্রস্তর, প্রান্তর, তরু, লতা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ—কেহই ক্ষণার্ধ তিষ্ঠিতে পারে না। সেই জন্য সূর্যের তেজঃ বায়ুস্তরের দ্বারা প্রশমিত হইয়া সংবৃত মূর্তিতে রশ্মিরূপে আমাদের গোচর হয়। এই সংবৃতির ফলেই সূর্যের উপকারিতা। ভগবানের সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা। সাধারণ মানুষের তো কথাই নাই, বোধ হয় অত্যুত্তম সাধকেরাও তাঁহার অনাবৃত ঐশ্বর্য, তাঁহার প্রকটিত মহিমা ধারণ করিতে পারেন না। সেই জন্যই তিনি অবতারের রূপে নিজেকে সংবৃত করিয়া, সেই আবরণের মধ্যে নিজের তেজঃ প্রশমিত করিয়া, জীবের নিকট প্রকাশিত হয়েন।

স্যার অলিভার লজের কথাগুলি বেশ সঙ্গত। আমাদের দেশে গঙ্গা-অবতরণের যে কাহিনী পুরাণের মধ্যে রক্ষিত আছে, তদ্দ্বারা ঐ কথার সমর্থন হয়। গঙ্গাকে বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা বলে। একদিন সাধকপ্রবর ভগীরথের আবাহনে ভগবানের আধ্যাত্মিক শক্তি ভূমণ্ডলে গঙ্গারূপে অবতরণ করিয়াছিল। কিন্তু সেই শক্তিকে মনুষ্যের ধারণোপযোগী করিবার জন্য প্রথমতঃ মহাদেবকে জটার মধ্যে সংবৃত করিতে হইয়াছিল এবং পরে জহ্নুমুনির শরীরের মধ্যে সংগোপিত করিতে হইয়াছিল। সেই জন্য গঙ্গার নাম জাহ্নবী। এইরূপে দ্বিধা-শিথিলিত বিষ্ণুতেজঃ ধরাধামে অবতীর্ণ হইলে, তবে গঙ্গা আমাদের ধারণোপযোগী হইয়া পতিতপাবনী হইয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রও 'ধর্মতত্ত্বে' এ বিষয়ের ইঙ্গিত করিয়াছেন—"ঈশ্বর অনন্তপ্রকৃতি—আমরা ক্ষুদ্রপ্রকৃতি। তাঁহার গুণগুলি সংখ্যায় অনন্ত, বিস্তারেও অনন্ত। যে ক্ষুদ্র, অনন্ত তাহার আদর্শ হইবে কি প্রকারে? সমুদ্রের আদর্শে কি পুকুর কাটা যায়, না আকাশের অনুকরণে চাঁদোয়া খাটান যায়?…অনন্তপ্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য; কিন্তু ঈশ্বরের অনুকারী মনুষ্যেরা, অর্থাৎ যাঁহাদিগের গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, অথবা যাঁহাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তাঁহারাই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন।"

'দেবীচৌধুরাণী'তে একথা আরও স্পষ্ট করা হইয়াছে—"ঈশ্বর অনন্ত—কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়পিঞ্জরে পুরিতে পারি না—সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর—হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ।"

যাহা হউক এ বিষয়ের আর বিস্তার করিব না। আমার বক্তব্যের মুখ্য কথা এই, বঙ্কিমস্মৃতি বাঙ্গালীর নিকট যেন চিরোজ্জ্বল হইয়া থাকে। এই উৎসবের ফলে সে প্রয়োজন যদি অংশতঃও সুসিদ্ধ হয়, তবে আমাদের উদ্যোগ-আয়োজন নিষ্ফল হইবে না।

বঙ্কিম-প্রতিভার ক্রম-বিকাশ

শ্রীযদুনাথ সরকার

বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালীর ভাবধারা আজ যে আকার ধারণ করিয়াছে, ইহাতে বঙ্কিমের কীর্ত্তি কি ? তিনি প্রাচী ও প্রতীচীর মধ্যে—ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে—এক সেতু রচনা করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এ সেতু একদিনে গড়া হয় নাই ; তাঁহার প্রতিভার ক্রমবিকাশ ধীরে ধীরে দেখিলে তবে বুঝিতে পারা যায়, কিরূপে এবং কতদিনে এই মহাকার্য্য সম্পূর্ণ হয়। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম রচনা 'রাজমোহনস্ ওয়াইফ্' (১৮৬৩ সালে তাঁহার ২৫ বৎসর বয়সে রচিত)। এটি ইংরেজী ভাষায় লেখা এবং ইংরেজী নভেলের ছাঁচে গড়া। তখন তাঁহার মন বিলাতী রহস্যপূর্ণ গল্প, যেমন 'কাস্‌ল্ অব্ অট্রাণ্টো' প্রভৃতির প্রভাবে আচ্ছন্ন, অথচ এই বইখানি বিলাতী নভেলের নকল নহে। দেবদত্ত প্রতিভার চিহ্নই ইহা যে, সে যাহা আহার করে তাহা পরিপাক করিয়া নিজস্ব করিয়া তোলে ; যুবক বঙ্কিম তাঁহার কল্পনার এই সর্ব্বপ্রথম সন্তানের মধ্যে এমন দুইটি জিনিস দিয়াছেন যাহা বাঙ্গালী ভিন্ন আর কেহ দিতে পারে না, যাহা বঙ্কিম ভিন্ন আর কেহ এত সুন্দর করিয়া দিতে পারিত না। একটি, বাঙ্গালী অন্তঃপুরের দৈনিক দৃশ্য, অপরটি বুদ্ধিমতী দৃঢ়চরিত্র বাঙ্গালী স্ত্রীর দৃষ্টান্ত। আপনারা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বঙ্কিমের প্রায় সব গ্রন্থেই পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকগুলির চরিত্র বেশি সবল, বেশি জীবন্ত, বেশি বিশেষত্ব গুণে ভূষিত।

আমরা তাঁহার নায়কদের অনেক আগে ভুলিব, কিন্তু তাঁহার নায়িকাগুলি পাঠকের মনে যে ছাপ দিয়া গিয়াছে, তাহা কখনও মুছিবে না,—কিন্তু এ দুইটা বিষয় বাদে বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাসের কাঠামো, গতি ও প্রভাব ঠিক বিলাতী।

তাহার পর তিনি ইংরেজী ছাড়িয়া বাঙ্গলা ধরিলেন (প্রভাকরে বাল্য রচনা বাদ দিলাম, সেগুলির জন্য তিনি অমর হইবেন না)। মাইকেলের মতই ধিক্কার পাইয়া, বিদেশী সাহিত্যের কাছে ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া, মাতার রত্নরাজির দিকে দৌড়িয়া আসিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রথম বাঙ্গলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'ও সেই ইংরেজী দৃষ্টান্তের প্রভাবে গঠিত। এখানে বলিয়া রাখি যে, এ কথা অসত্য যে 'দুর্গেশনন্দিনী' 'আইভ্যান্ হো'র ছায়ায় রচিত ; কারণ বিনীত আত্মসম্মানে সঙ্কুচিত দলিত ইহুদিকন্যা 'রেবেকা' এবং দৃপ্ত স্বাধীন নবাবপুত্রী 'আয়েষা'র মধ্যে কিছুমাত্র চরিত্রগত সাদৃশ্য নাই।

কিন্তু বঙ্কিমের প্রতিভার ক্রমবিকাশের ফলে তাঁহার শেষ উপন্যাসগুলিতে যে অমৃত-রস পাই, 'দুর্গেশনন্দিনী'তে তাহা পাই না; এই অমৃতরসের উৎস তাঁহার হৃদয়ে, ইহা ভগবদ্গীতার দান; স্বদেশ-প্রেম ও ধর্ম্মে মতি এই উভয়ের অপূর্ব্ব মিলন সংঘটন করিয়া, তাঁহার প্রতিভায় ও তাঁহার হৃদয়ে এক নূতন মিশ্র পদার্থের আকার ধারণ করিয়াছে।

তাঁহার গভীর ও বিস্তৃত ইংরেজী শিক্ষার উপর ভগবদ্গীতার প্রভাবের এই ফল। এই জন্য আমরা তাঁহার পরিপক্ক বয়সের উপন্যাসগুলিতে পাই এমন একটি উপকরণ যাহা তাঁহার যৌবনের গল্পগুলিতে নাই। সেটিকে আদর্শবাদ না বলিয়া ঊর্দ্ধপ্রবাহিনী ভাব-ধারা বলিলে সহজ হইবে, অর্থাৎ ইংরেজী কথায় idealising element। 'দুর্গেশনন্দিনী', 'বিষবৃক্ষ' খুব সুন্দর গল্প, কিন্তু গল্পমাত্র। 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' গল্প বটে, কিন্তু উপন্যাসের অধিক, এগুলি গল্পের ভিতর দিয়া আস্তে আস্তে অদৃশ্যে নিঃশব্দে পাঠকের চিত্তকে দেবলোকে লইয়া যায়, এই মহাকাব্যগুলি সত্য সত্যই প্রমাণ করে যে "স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আছে।" বঙ্গমাতার অপার করুণায় তাঁহার অন্য অনেক বরপুত্র অমর গল্প লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেগুলিতে এরূপ কল্পনার মন্দাকিনীপ্রবাহ নাই, তাঁহারা "ত্রিস্রোতসং বহতি ন গগন-প্রতিষ্ঠাং।" কিন্তু বঙ্কিমের শেষ বয়সের উপন্যাসগুলি এই অলৌকিক কার্য্য, এই সাহিত্যিক জাদুগরী, করে।

একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত দিয়া এই কথাটা বুঝাইব, বঙ্কিমের অনেক গল্পেই ডাকাত আছে। 'রাজমোহন্‌স্ ওয়াইফ্'এর ডাকাত শুধু ডাকাত, 'রাজসিংহে'র মাণিকলাল পলিটিক্যাল্ ডাকাত। আর সত্যানন্দ, ভবানী ঠাকুর ডাকাত বটে, কিন্তু কত উঁচুমনা, কত বিভিন্ন শ্রেণীর। তাহারা যেন বর্জাইস্ টাইপে ছাপা ভগবদ্গীতা সর্ব্বদা পকেটে লইয়া বনে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়ায়।

অর্থাৎ মনোরম গল্পের ভিতর দিয়া, আমাদের পরিচিত সংসারের কাহিনীর ছবির ভিতর দিয়া, দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত একটা অপরিচিত লোকে, একটা চরমপ্রায় অমানুষিক নৈতিক আদর্শে যে পৌঁছান যায় এবং সেই কাল্পনিক দেবলোকে আমাদের চিত্তের চিরবসতি যে লাভ করিতে হইবে, এই সত্য বঙ্কিমের শেষ উপন্যাসগুলির প্রতিপাদ্য বিষয়, এবং সেই প্রয়াসে যে তিনি সফল হইয়াছেন তাহার সাক্ষী লক্ষ লক্ষ পাঠকের হৃদয়।

তাঁহার দেবদত্ত প্রতিভার ক্রমবিকাশের আর এক সাক্ষী তাঁহার ভাষা (এখানেও তাঁহার প্রথমকার ছোট ছোট রচনা, ঈশ্বর গুপ্তের স্কুলে হাতেখড়ির ফলগুলি বাদ দিলাম)।

বঙ্কিমের প্রথমকার গদ্যে আছে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য—সংস্কৃত ভাষার প্রভাব তখনও বাঙ্গলা সাধুরচনায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সংস্কৃত কাব্যের বুক্‌নী তাঁহার এই রচনাগুলির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়, কিন্তু সাধারণ লোকের, বিশেষতঃ স্ত্রীচরিত্রের কথাবার্ত্তায় নহে,—তাহা প্রথম হইতেই

স্বাভাবিক ছিল। পরে বঙ্কিমের ভাষা অনেক নরম অনেক সহজ হইল ; লৌহবর্ম্মের দৃঢ়তা ছাড়িয়া দিয়া রক্তমাংসে গঠিত জীবন্ত মানবদেহের স্বাভাবিক স্পন্দন, ভাবের প্রতি আঘাতে হিল্লোল যেন পাইল। অথচ কখনও ঠিক বীরবলী ভাষায় পরিণত হয় নাই ; শেষ পর্য্যন্ত সংযম, অভিজাতের উচিত আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল।

বিদ্যাদিগ্‌গজের কথাবার্ত্তার সহিত 'সীতারামে'র রাজ্যধ্বংসের ঐতিহাসিকযুগল, আমাদের প্রিয় বন্ধু শ্যামচাঁদ ও রামচাঁদের 'ঢেলে সেজে' খাইতে খাইতে বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের গভীর গবেষণা করিবার সময়কার ভাষার তুলনা করুন।

'রাজমোহন্‌স্ ওয়াইফে'র স্রষ্টিকর্ত্তা অন্তিমে একেবারে স্বদেশী হইয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

বাঁশী আর বাজিল না কতকাল অজয়ের কূলে,
কীর্ত্তনের সুরে শুধু ভরি' উঠে আকাশ বাতাস
বাঙ্গালার, সব গানে প্রেমেরই সে দীর্ঘ হাহা-শ্বাস
নদীয়ার নদীপথে মর্ম্মরিল বঞ্জুল-মঞ্জুলে!
ত্যজিয়া তমালতল রাধা জ্বালে তুলসীর মূলে
প্রাণের আরতি-দীপ; আঁখির সে বিলোল বিলাস
ভুলিয়াছে, কাঁদে আর হরিনাম জপে বারো মাস,
কল্পবৃক্ষে ফোটে প্রেম, ফোটে না সে মনের মুকুলে!
এমনই সে সারা বঙ্গ অঙ্গে পরি' হরিনামাবলী
বাদল-বসন্ত-নিশি গোঙাইল উদাসীন-সুখে;
রাখালের বেণুরবে গোঠে মাঠে কাননে কান্তারে
ধ্বনিল যে মধু-গীতি তাহারি সে সরস ঝঙ্কারে
ক্বচিৎ উন্মনা কেহ,—ঘটে বারি উঠিল উছলি',
গাঁথিতে পূজার মালা কোন্ ব্যথা গুমরিল বুকে!

মুক্তবেণী জাহ্নবীর ক্রমে লুপ্ত হ'ল সরস্বতী
শাস্ত্র-বালুকার বাঁধে, মন্ত্রে তন্ত্রে শুকাইল শেষে
প্রাণের সে প্রীতি সহজিয়া; এমন মাটির দেশে
জীবনের ছাঁচে কেহ গড়িল না প্রেমের মূরতি!
মাতা পুত্র পিতা আছে, আছে পতি আর আছে সতী—
দম্পতী নাহিক' কোথা! নারী শুধু সহচরী-বেশে
পতির চিতায় উঠে, বৈকুণ্ঠের সুদূর উদ্দেশে!
পুরুষ স্বামীই শুধু—নাহি তার প্রেমে অধোগতি।

সন্ধ্যা হ'লে শঙ্খ বাজে গৃহে গৃহে মন্দিরে মন্দিরে,
ঘাট হ'তে ঘরে ফিরে দীপ জ্বালে ত্বরায় বধূরা ;
একে একে উঠে আসে তারকারা আকাশের তীরে,
সমীরণ শ্বসে মৃদু, ফুলগন্ধে রজনী মধুরা ;
নিদ্রার নিশীথ-স্বপ্নে জেগে ওঠে বিরহ-বিধুরা
জীয়াইতে মৃত-প্রেম, তনু তার বীজনিয়া ধীরে !

এমনই কাটিল যুগ, যুগান্তের নিশা-অবসানে
দখিনা-পবন সাথে ভাগীরথী বহিল উজান ;
দুয়ারে দাঁড়াল সিন্ধু, তার সেই আকুল আহ্বান
স্বপনেরে ছিন্ন করি' কি বারতা বিতরিল প্রাণে !
উছসি' উঠিল ঢেউ বাঁধা-ঘাটে সোপান-পাষাণে,
কূল সে অকূল হ'ল, পিপাসার নাহি পরিমাণ !
আকাশ আসিল নামি'—অন্তরীক্ষে কারা গায় গান !
দেবতা কহিল কথা চুপি চুপি মানুষের কানে !
স্বপনে ছিল না যাহা ধরা দিল তাই জাগরণে—
পুরুষের চোখে রূপ—হর-চক্ষে উমা হৈমবতী !
সে নহে কিশোরী-বালা, শ্যাম-শোভা নবীনা ব্রততী—
নতুঞাবদনী রাধা—যমুনায় গাগরী-ভরণে।
সে রূপের ধ্যান লাগি' যোগী করে শ্মশানে বসতি—
পান করে কালকূট মহাসুখে, ডরে না মরণে !

সতত স্বাধ্যায়শীল আত্মভোলা গৃহী-ব্রহ্মচারী
পুঁথি হ'তে চোখ তুলি' একদা সে নিজ নারীমুখে
নেহারি' কিসের ছায়া জলাঞ্জলি দিল সব সুখে,
ক্ষুধায় আকুল হ'ল—প্রাণ যার ছিল নিরাহারী !
গৃহ যার স্বর্গ ছিল সেও সাজে পথের ভিখারী—
মজিল, শেফালি ফেলি' রাগরক্ত রূপের কিংশুকে,
মন্দারের মালা ছিঁড়ি' আশীবিষ তুলি' নিল বুকে—
যত জ্বালা তত সুখ, তত ঝরে নয়নের বারি।

সর্ব্বত্যাগী বীর যুবা আত্মজয়ে করি' প্রাণ-পণ
সফল সাধনা তার বলি দিবে নারীপদমূলে—
মৃত্যুর অনলে শেষে সেই দাহ করিল নির্ব্বাণ !
নিজেরি সে পত্নী, তবু আজ দূর দেবীর সমান—
কিছুতে দিবে না ধরা, পতি-প্রেম গিয়েছে সে ভুলে,
তারি লাগি' রাজা রাজ্য ঘুচাইল, সর্ব্বস্ব আপন !

বাল্য-প্রণয়ের সুধা বিষ হ'ল নবীন যৌবনে,
সাঁতারি' অগাধ জলে, দোঁহে মিলি' করিল উপায়—
নির্ভয়ে ডুবিল যুবা, আর জন দেখে ভয় পায় ;
পুরুষ মরিল, নারী ফিরে চলে পতির ভবনে !
শিবিরে নামিছে সন্ধ্যা—অন্ধকার মনে ও ভুবনে,
'কেন বা মরিবে প্রিয় ?' প্রণয়িনী কাতরে শুধায়,
হেন কালে কার ছায়া হেরি' বীর মুহু মূরছায়—
'মরিতেই হবে' বলি' হানে কর ললাটে সঘনে !
এ নহে কবির ভ্রম, নহে চন্দ্র পথের পল্বলে,
অথবা সে মৃত্যুলোভী পতঙ্গের নব বহ্নিস্তুতি ;
যেই শক্তি নারীরূপা—বিধি-বিষ্ণু-হরের প্রসূতি—
সেই পুন নিবসিল পুরুষের চিত্তশতদলে ;
জীবনেরই যজ্ঞে সে যে স্বাহা-মন্ত্রে প্রাণের আহুতি—
মরা গাঙে ডাকে বান, মৃত্যু মাঝে অমৃত উথলে !

আঁধার শ্রাবণ-রাতে কাঁদে কে বা আর্দ্র বায়ুশ্বাসে ?—
ধূলায়-ধূসরস্তনী, প্রিয়প্রাণহন্ত্রী—পাগলিনী !
পতিরে করিতে সুখী অশ্রুহীনা কোন্ অভাগিনী—
নিমীলিত আঁখি, মুখ বিষ-নীল—সুখহাসি হাসে !
শারদীয়া জ্যোৎস্না-রাতি, ভরা নদী, স্রোতে তরী ভাসে—
তারি 'পরে কাঁদে বীণ, স্বপ্নে তাই শোনে নিশীথিনী !
ভৈরবী-পালিতা যেই—কামে প্রেমে সম-উদাসিনী—
কি স্নেহে, মশানে তার ভাগ্যহত স্বামীরে সম্ভাষে !

মাঠ বাট গোষ্ঠ হ'তে এ বঙ্গের জীবন-জাহ্নবী
বহিল উজানে পুন স্বদুর্গম দূর হিমাচলে—
যেথায় তারকা-তলে দেওদার-নমেরু-অটবী
রতি-বিলাপের গাথা স্মরে আজও শিশিরের ছলে ;
হর তবু হেরে যেথা মুগ্ধনেত্রে গৌরী-মুখচ্ছবি—
বঙ্কিম চন্দ্রের কলা ভালে তাঁর অনিমেষে জলে !

বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙ্গালা ভাষা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বঙ্কিমচন্দ্র এক স্থলে লিখিয়াছেন—"অস্ত্রবল অপেক্ষা বাক্যবল গুরুতর, সমরাপেক্ষা শিক্ষা অধিকতর ফলোপধায়ী।" পৃথিবীর ইতিহাসে এই উক্তির যাথার্থ্য বহুবার বহুরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। শিক্ষা সমরাপেক্ষা ফলোপধায়ী। কিন্তু সেই শিক্ষাও বাক্যবলসাপেক্ষ —ভাষার সাহায্য ব্যতীত শিক্ষা-প্রচার দুষ্কর। বাক্য যতক্ষণ সুপ্রযুক্ত না হয়, ততক্ষণ তাহার শক্তির বিকাশ হয় না। সেই জন্যই ভাষাকে ভাবপ্রকাশের উপযোগী করিতে হয় এবং যাঁহারা কোন জাতির ভাষাকে সর্ব্বভাবপ্রকাশক্ষম করেন, তাঁহারা সেই কার্য্যের দ্বারাই জাতিকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেন—জাতির নমস্য হয়েন।

বঙ্গদেশে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষাকে যেরূপে পুষ্ট ও সংস্কৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই আজ সেই ভাষা জড়ত্বমুক্ত হইয়া আনন্দে উচ্ছলিত, আবেগে উচ্ছ্বসিত, বিষাদে বিকুঞ্চিত, লজ্জায় বিকুণ্ঠিত, দ্বিধায় বিচলিত, ক্রোধে বিকম্পিত হয়। আজ সেই ভাষা—কোথাও জ্যোৎস্নালোকপ্লাবিত নীলাম্বরতলে বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিতবক্ষ স্রোতস্বতীর মত বহিয়া যায়; আবার কোথাও তাহা "বর্ষারাশিপ্রমথিতা" পরিপূর্ণা স্রোতস্বতীর মত বৃক্ষলতাতৃণশোভিত বেলাভূমি ভঙ্গ করিয়া কলনাদে প্রবাহিত হয়। তাহা "সাগরবৎ-হৃদয়োত্থিত বিলোল তরঙ্গমালায় সংক্ষুব্ধ···ইহার প্রবল বেগ, দুরন্ত কোলাহল, বিলোল উর্ম্মিলীলা—আর ইহার মধুর নীলিমা, ইহার অনন্ত আলোকচূর্ণ-প্রক্ষেপ, ইহার জ্যোতিঃ, ইহার ছায়া"—মনোরম।

এই ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি বলিলেও বলা যায়। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যিকদিগের ভাষার সহিত তাঁহার বিবিধ রচনার উপযোগী বিবিধ প্রকৃতির ভাষা লক্ষ্য করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের ভাষার বিরুদ্ধে যিনি প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সেই কার্য্য "অক্ষয়কীর্ত্তি" বলিতে কিছুমাত্র দ্বিধানুভব করেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যে সেই বিদ্রোহী "টেকচাঁদ ঠাকুরে"র স্থাননির্দ্দেশপ্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেই ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার মত—অখণ্ডনীয় মত—বুঝিতে পারা যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"এক জনের কথা অপরকে বুঝান ভাষামাত্রেরই যে উদ্দেশ্য, ইহা বলা অনাবশ্যক। কিন্তু কোন কোন লেখকের রচনা দেখিয়া বোধ হয় যে, তাঁহাদের বিবেচনায় যত

অল্প লোকে তাঁহাদিগের ভাষা বুঝিতে পারে, ততই ভাল…অন্যে তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া কোন উপকার পাইবে, এরূপ যে লেখকের উদ্দেশ্য, তিনি সচরাচর বোধগম্য ভাষাতেই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া থাকেন। যে দেশের সাহিত্যে সাধারণ বোধগম্য ভাষাই সচরাচর ব্যবহৃত হয়, সেই দেশের সাহিত্যই দেশের মঙ্গলকর হয়।…গদ্য যত সুখবোধ্য হইবে, সাহিত্য ততই উন্নতিকারক হইবে। যে সাহিত্যের পাঁচ সাত জন মাত্র অধিকারী, সে সাহিত্যের জগতে কোন প্রয়োজন নাই।

"প্রাচীনকালে অর্থাৎ এ দেশে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে, বাঙ্গালায় সচরাচর সংস্কৃতের ন্যায় পদ্যই হইত। গদ্য-রচনা যে ছিল না, এমন কথা বলা যায় না… মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইলে গদ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রথম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের গদ্য-লেখক। তাঁহার পর যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এমন কি বাঙ্গালা ভাষা দুইটি স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটির নাম সাধুভাষা অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য্য ভাষা, আর একটির নাম অপর ভাষা অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য্য ভাষা। এস্থলে সাধু বলিতে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে। আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃত-ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না—'খদির' বলিতেন; কদাচ 'চিনি' বলিতেন না—'শর্করা' বলিতেন। 'ঘি' বলিলে তাঁহাদের রচনা অশুদ্ধ হইত, 'আজ্য'ই বলিতেন, কদাচিৎ কেহ 'ঘৃতে' নামিতেন। 'চুল' বলা হইবে না—'কেশ' বলিতে হইবে। 'কলা' বলা হইবে না—'রম্ভা' বলিতে হইবে। ফলাহারে বসিয়া 'দই' চাহিবার সময় 'দধি' বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে। আমি দেখিয়াছি, একজন অধ্যাপক এক দিন 'শিশুমার' ভিন্ন 'শুশুক' শব্দ মুখে আনিবেন না, শ্রোতারাও কেহ 'শিশুমার' অর্থ জানে না; সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন, তাহার অর্থবোধ লইয়া অতিশয় গণ্ডগোল পড়িয়া গিয়াছিল। পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত ভাষা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। এরূপ ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রণীত হইলে, তাহা তখনই বিলুপ্ত হইত; কেন না, কেহ তাহা পড়িত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন শ্রীবৃদ্ধি হইত না।

"এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইঁহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্ব্বোধ্য নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে

কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সর্ব্বজনবোধগম্যা ভাষা হইতে ইহা অনেক দূরে রহিল। সকল প্রকার কথা এ ভাষায় ব্যবহার হইত না বলিয়া ইহাতে সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করা যাইত না এবং সকল প্রকার রচনা ইহাতে চলিত না। গদ্যে ভাষার ওজস্বিতা এবং বৈচিত্র্যের অভাব হইলে, ভাষা উন্নতিশালিনী হয় না। কিন্তু প্রাচীন প্রথায় আবদ্ধ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার মনোহারিতায় বিমুগ্ধ হইয়া কেহই আর কোন প্রকার ভাষায় রচনা করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্য পূর্ব্বমত সঙ্কীর্ণ পথেই চলিল।"

আরও এক বিপদ ছিল—সাহিত্যের ভাষাও যেমন সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তদধিক সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র অকুণ্ঠ কণ্ঠে বলিয়াছেন :—

"এই দুইটি গুরুতর বিপদ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধৃত করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থপ্রণয়নে ব্যবহার করিলেন।...'আলালের ঘরের দুলাল' বাঙ্গালা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন, অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন, কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলালে'র দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ।"

'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাষা যে আদর্শ ভাষা নহে, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি তথাপি উহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন—অন্যত্র বলিয়াছেন —" 'টেকচাঁদ ঠাকুর' প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন।...তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রণয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেই দিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।"

যিনি বিদ্রোহী, তাঁহার বিদ্রোহঘোষণার উদ্দেশ্যে মুগ্ধ হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র সেই প্যারীচাঁদ মিত্রকে পথিপ্রদর্শকের প্রশংসায় সম্মানিত করিয়াছিলেন।

ভাষা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা ও মত অভ্রান্ত ও দৃঢ় ছিল বলিয়াই তিনি নানারূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা অনায়াসে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিয়া ভাষার সংস্কারসাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শেষ উপন্যাস 'রাজসিংহ' রচনাকাল পর্য্যন্ত তিনি ভাষার সংস্কার ও প্রসাধনসাধনে বিরত হয়েন নাই। যাঁহারা 'দুর্গেশনন্দিনী' হইতে 'রাজসিংহ' পর্য্যন্ত

মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই, তিনি ভাষা যেমন সরল তেমনই শক্তিশালী করিতেই আপনার উদ্যম প্রযুক্ত করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা যে বিশুদ্ধির ও সৌন্দর্য্যের জন্য বিশেষ প্রশংসনীয়, তাহা সংস্কৃতানুসারী ভাষার অনুরাগীরা প্রীতির দৃষ্টিতে দেখেন নাই। রামগতি ন্যায়রত্ন বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা 'আলালী' ভাষার সহিত প্রায় একপর্য্যায়ভুক্ত করিয়া লিখিয়াছিলেন :—

" 'হুতোম পেচা' বল, 'মৃণালিনী' বল—পত্নী বা পাঁচজন বয়স্যের সহিত পাঠ করিয়া আমোদ করিতে পারি—কিন্তু পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিত মুখে কখনই ও সকল পড়িতে পারি না। বর্ণনীয় বিষয়ের লজ্জাজনকতা উহা পড়িতে না পারিবার কারণ নহে; ঐ ভাষারই কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুজনসমক্ষে উচ্চারণ করিতে লজ্জাবোধ হয়। পাঠকগণ! যদি আপনাদের উপর বিদ্যালয়ের পুস্তক-নির্ব্বাচনের ভার হয়, আপনারা আলালী ভাষায় লিখিত কোন পুস্তককে পাঠ্যরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন কি? বোধ হয় পারিবেন না। কেন পারিবেন না?—ইহার উত্তরে অবশ্য এই কথা বলিবেন যে, ওরূপ ভাষা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ নয় এবং উহা সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করিতে লজ্জা বোধ হয়।"

যিনি 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাষার সহিত 'মৃণালিনী'র ভাষার প্রভেদ বুঝিতে চাহেন না, তাঁহার কথার গুরুত্ব যেরূপই কেন হউক না, সে সময়ে যে 'মৃণালিনী'র মার্জ্জিত ভাষাও কেহ কেহ গাম্ভীর্য্যবর্জ্জিত মনে করিতেন, তাহার প্রমাণে আমরা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তির উল্লেখ করিতে পারি। তিনি একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, তিনি যখন বহরমপুর কলেজে অধ্যাপক এবং বঙ্কিমচন্দ্র তথায় অন্যতম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, সেই সময় একদিন অপরাহ্ণে একত্র ভ্রমণকালে ভাষার আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে বলেন, বঙ্কিমচন্দ্র ভাষা সরল ও সহজবোধ্য করিবার জন্য হয়তো তাহার গাম্ভীর্য্য ক্ষুণ্ণ করিতেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন সে কথার কোন উত্তর দেন না; পরে সন্ধ্যাসমাগমে উভয়ে যে যাহার বাসগৃহে যাইবার জন্য যখন বাজারের মধ্যবর্ত্তী পথে উপনীত হয়েন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র সহসা তাঁহাকে বলেন—"এই বিপণিশ্রেণী আলোকমালায় সুসজ্জিতা হইয়া কি সুন্দর শোভাময়ী হইয়াছে।" গুরুদাসবাবু এই ভাষাপ্রয়োগে বিস্মিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিলে বঙ্কিমচন্দ্র হাসিয়া বলেন—"এখন বুঝিলেন, কি জন্য ভাষা সরল করা প্রয়োজন?"

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উক্তি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র কেবল বলিয়াছিলেন :—

"আমাদের এরূপ বোধ আছে যে, সরল ভাষাই শিক্ষাপ্রদ। ন্যায়রত্ন মহাশয় কেন সরল ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ নহে বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা আমরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। বোধ হয় বাল্যসংস্কার ভিন্ন আর কিছুই সরল ভাষার প্রতি তাঁহার বীতরাগের কারণ নহে।"

যে সময় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ভাষার গঠনে নিযুক্ত ছিলেন, তখনই ভাষা লইয়া মতভেদ স্বপ্রকাশ হইয়াছে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জন বীম্‌স্ তাঁহার ভারতীয় ব্যাকরণ—'A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India' রচনা করেন। তাহার উপক্রমণিকাংশে তিনি ইহার উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—বর্ত্তমানে বাঙ্গালী লেখকরা দুই ভাগে বিভক্ত—এক দল সংস্কৃতের ভক্ত, অপর দল ইংরেজীর অনুরাগী। তিনি শেষোক্ত দলের লেখকদিগের মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের ও কালীপ্রসন্ন সিংহের ('হুতোম') নামোল্লেখ করিয়া শেষে বলেন :—

"That the Bengalis possess the power as well as the will to establish a national literature of a very sound and good character, cannot be denied, and it is to be hoped that the ponderous highflown Sanskrit style will be laughed out of the field by Tekchand Thakur and his light-armed troops so that Bengalis may write as they talk, and improve their language, not by wholesale importations from the dead Sanskrit, but by adopting and adhering to one standard universal system of spelling, and by selecting from the copious stores of their local dialects such vigorous and expressive words as may best serve to express their thoughts. If the style of any one writer were taken as a model by the rest, a standard would soon be set up, and Bengali would become a literary language."

তিনি তখনই লক্ষ্য করিয়াছিলেন, জাতীয় সাহিত্য-রচনার ক্ষমতা ও আগ্রহ বাঙ্গালীর আছে, এবং সেই জাতীয় সাহিত্য উৎকৃষ্টই হইবে। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, যদি কোন একজন লেখকের রচনারীতি আর সকল লেখক আদর্শরূপে গ্রহণ করেন, তবে অতি শীঘ্রই একটি আদর্শ রচনা-পদ্ধতি পরিণত হইবে ও বাঙ্গালা সাহিত্যিক ভাষায় পরিণতি লাভ করিবে।

ইহাই হইয়াছিল; এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা ও রচনা-পদ্ধতি আদর্শরূপে গ্রহীত হইয়াছিল বলিয়াই বাঙ্গালা ভাষার ও সাহিত্যের দ্রুত উন্নতি হইয়াছিল।

আজ যাঁহারা ভাষায় যথেচ্ছা পরিবর্ত্তনের প্রবর্ত্তন করিতে আগ্রহশীল হইয়াছেন, তাঁহারা যদি ইহা বিবেচনা করিয়া দেখেন, তবে তাঁহাদিগের সেই আগ্রহের প্রশমন হইবে, সন্দেহ নাই।

আমরা বলিয়াছি, ভাষা সম্বন্ধে মতভেদ বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তখনই শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (Bengali, Spoken and Written—1877)। তিনি বহুবচন

জ্ঞাপন জন্য "গণ" ব্যবহারের বিরোধী—তিনি বাঙ্গালায় লিঙ্গভেদ মানিতে অসম্মত—তিনি সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দ, যথা একাদশ বা চত্বারিংশৎ বা দুই শত ইত্যাদি ব্যবহার করিতে দিবেন না—তিনি ভ্রাতা, কল্য, কর্ণ, স্বর্ণ, তাম্র, পত্র, মস্তক, অশ্ব প্রভৃতি ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া ভাই, কাল, কাণ, সোণা প্রভৃতির ব্যবহার করাইতে প্রয়াসী। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রস্তাব বাঙ্গালা ভাষার উপর "দৌরাত্ম্য" বলিয়াছিলেন। তিনি শ্যামাচরণবাবুর প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে আপনার মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা শব্দ ত্রিবিধ ঃ—

প্রথম,—সংস্কৃতমূলক শব্দ, বাঙ্গালায় রূপান্তরিত হইয়াছে,

দ্বিতীয়,—সংস্কৃতমূলক যে সব শব্দ বাঙ্গালায় রূপান্তরিত হয় নাই,

তৃতীয়,—সংস্কৃতের সহিত সম্পর্কশূন্য শব্দ।

শ্যামাচরণবাবু প্রথম শ্রেণীর শব্দের পরিবর্ত্তে অবিকৃত অর্থাৎ রূপান্তরিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের বিরোধী। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন ঃ—

"এক্ষণে 'বামণ'ও যেমন প্রচলিত, 'ব্রাহ্মণ'ও সেইরূপ প্রচলিত। 'পাতা' যেরূপ প্রচলিত, 'পত্র' ততদূর না হউক, প্রায় সেইরূপ প্রচলিত। 'ভাই' যেরূপ প্রচলিত, 'ভ্রাতা' ততদূর না হউক প্রায় সেইরূপ প্রচলিত। যাহা প্রচলিত হইয়াছে, তাহার উচ্ছেদে কোন ফল নাই, উচ্ছেদ সম্ভবও নহে। কেহ যত্ন করিয়া 'মাতা', 'পিতা', 'ভ্রাতা', 'গৃহ', 'তাম্র', বা 'মস্তক' ইত্যাদি শব্দ বাঙ্গালা ভাষা হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিবেন না। আর বহিষ্কৃত করিয়াই বা ফল কি? এ বাঙ্গালা দেশে কোন্ চাষা আছে যে, ধান্য, পুষ্করিণী গৃহ বা মস্তক ইত্যাদি শব্দের অর্থ বুঝে না? যদি সকলে বুঝে, তবে কি দোষে এই শ্রেণীর শব্দগুলি বধার্হ? বরং ইহাদের পরিত্যাগে ভাষা কিয়দংশে ধনশূন্যা হইবে মাত্র। নিষ্কারণ ভাষাকে ধনশূন্যা করা কোনক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে।"

তিনি বলেন, যে সব শব্দের রূপান্তর হয় নাই, কেবল উচ্চারণ বৈলক্ষণ্য হইয়াছে, সে সব শব্দের আদিম রূপ রক্ষা করাই ভাষার স্থায়িত্বের কারণ হয়। "আমরা এমন বলি না যে, 'ঘর' প্রচলিত আছে বলিয়া 'গৃহ' শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে, অথবা 'মাথা' শব্দ প্রচলিত আছে বলিয়া 'মস্তক' শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে ; কিন্তু আমরা এমত বলি যে, অকারণে 'ঘর' শব্দের পরিবর্ত্তে 'গৃহ', অকারণে 'মাথা'র পরিবর্ত্তে 'মস্তক', অকারণে 'পাতা'র পরিবর্ত্তে 'পত্র' এবং 'তামা'র পরিবর্ত্তে 'তাম্র' ব্যবহার করা উচিত নহে।...আমরা 'ভ্রাতা' শব্দ উঠাইয়া দিতে চাহি না বটে, কিন্তু সচরাচর আমরা 'ভাই' শব্দ ব্যবহার করিতে চাই। 'ভ্রাতা' শব্দ রাখিতে চাই, তাহার কারণ এই যে, সময়ে সময়ে তদ্ব্যবহারে বড় উপকার হয়। 'ভ্রাতৃভাব' এবং 'ভাইভাব', 'ভ্রাতৃত্ব' এবং 'ভাইগিরি' এতদুভয়ের তুলনায় বুঝা যাইবে যে, কেন 'ভ্রাতৃ' শব্দ বাঙ্গালায় বজায় রাখা উচিত।"

যে স্থানে অন্য কোন ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিতে হয়, সে স্থানে বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত হইতে শব্দ গ্রহণেরই পক্ষপাতী। শ্যামাচরণবাবু বলেন, হিন্দু লেখকরা যে সংস্কৃতের অনুরাগী তাহার কারণ, সংস্কৃতের সহিত ভারতের গৌরব-যুগের স্মৃতি এবং আরবী ও পারসীর সহিত তাহার দাসত্বের স্মৃতি বিজড়িত—"With Sanskrit are associated the days of India's greatest glory, with Persian and Arabic, the days of her defeat, humiliation and bondage. The budding patriotism of Hindus everywhere would therefore naturally eschew Persian and Arabic words as badges of slavery." কিন্তু প্রয়োজনে বাঙ্গালায় যে বহু বিদেশী শব্দ গৃহীত হইয়াছে, তাহা ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে :—

"সম্মুখে সেপাই সব কাতার কাতার।
যোড় হাতে বুকে ধরে ঢাল তরবার ॥
ঘড়ীয়াল দুই পাশে হাতে বালি ঘড়ী।
সারি সারি চোপদার হাতে হেমছড়ী ॥
অগ্রেতে আরজবেগী আরজী লইয়া।
ভাটে পড়ে রায়বার যশো বর্ণাইয়া ॥"

বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্কৃত শব্দের প্রতি অনুরাগের অন্য কারণও তিনি বিবৃত করিয়াছেন :—

"হিন্দী, মারহাট্টী প্রভৃতি সংস্কৃতের দৌহিত্রী হইলে হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা যেন সংস্কৃতের কন্যা বলিয়া বোধ হয়। প্রাকৃতে 'কার্য্যে'র স্থানে 'কজ্জ' বলিত। আমাদের চাষার মেয়েরাও 'কার্য্যের' স্থানে 'কায্যি' বলে। 'বিদ্যুতে'র স্থানে 'বিজলি'ও বলি না, 'বিজুলি'ও বলি না ; চাষার মেয়েরাও 'বিদ্যুৎ' বলে।"

তিনি বলেন, যদি ঋণ করিতে হয় তবে চিরকালের "মহাজন" সংস্কৃতের দ্বারস্থ হওয়াই মঙ্গল। "প্রথমতঃ সংস্কৃত মহাজনই পরম ধনী ; ইহার রত্নময় শব্দ-ভাণ্ডার হইতে যাহা চাও, তাহাই পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে শব্দ লইলে, বাঙ্গালার সঙ্গে ভাল মিশে। বাঙ্গালার অস্থি, মজ্জা, শোণিত, মাংস সংস্কৃতেই গঠিত। তৃতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে নূতন শব্দ লইলে অনেকে বুঝিতে পারে ; ইংরেজী বা আরবী হইতে লইলে কে বুঝিবে ?...অতএব যেখানে বাঙ্গালা শব্দ নাই, সেখানে অবশ্য সংস্কৃত হইতে অপ্রচলিত শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে।"

বঙ্কিমচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালার বড় আদর করিতেন। তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁহার নিকট আপনার ঋণ স্বীকার করিয়াছেন, সেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে "অপূর্ব্ব শব্দকৌশলী" বলিয়া তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায়, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের

ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই। তাহাতে সংস্কৃতজনিত কোন বিকার নাই—ইংরাজীনবিশীর বিকার নাই। পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই—বিশুদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না—সরল সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে।”

বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট ইহাই ভাষার আদর্শ। কারণ—

“সাহিত্য কি জন্য? গ্রন্থ কি জন্য? যে পড়িবে, তাহার বুঝিবার জন্য। না বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া পাঠক ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিবে, বোধ হয়, এ উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ লিখে না—যদি এ কথা সত্য হয়, তবে যে ভাষা সকলের বোধগম্য—অথবা যদি সকলের বোধগম্য ভাষা না থাকে, তবে যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য—তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত। যদি কোন লেখকের এমন উদ্দেশ্য থাকে যে, আমার গ্রন্থ দুই চারি জন শব্দপণ্ডিতে বুঝুক, আর কাহারও বুঝিবার প্রয়োজন নাই, তবে তিনি গিয়া দুরূহ ভাষায় গ্রন্থপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হউন। যে তাঁহার যশ করে করুক, আমরা কখন যশ করিব না। তিনি দুই এক জনের উপকার করিলে করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে পরাপকারক খলস্বভাব পাষণ্ড বলিব। তিনি জ্ঞানবিতরণে প্রবৃত্ত হইয়া চেষ্টা করিয়া অধিকাংশ পাঠককে আপনার জ্ঞানভাণ্ডার হইতে দূরে রাখেন। যিনি যথার্থ গ্রন্থকার তিনি জানেন যে, পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই, জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই। অতএব যত অধিক ব্যক্তি গ্রন্থের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারে, ততই অধিক ব্যক্তি উপকৃত—ততই গ্রন্থের সফলতা। জ্ঞানে মনুষ্যমাত্রেরই তুল্যাধিকার। যদি সে সর্ব্বজনের প্রাপ্য ধনকে তুমি এমত দুরূহ ভাষায় নিবদ্ধ রাখ যে, কেবল যে কয় জন পরিশ্রম করিয়া সেই ভাষা শিখিয়াছে, তাহারা ভিন্ন আর কেহ তাহা পাইতে পারিবে না, তবে তুমি অধিকাংশ মনুষ্যকে তাহাদিগের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিলে। তুমি সেখানে বঞ্চক মাত্র।”

সেই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্রোহী ‘টেকচাঁদে’র প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু ‘আলালের ঘরের দুলালে’র ভাষা যে আদর্শ ভাষা নহে, তাহা তিনি জানিতেন এবং জানিয়া তাহা ব্যক্ত করিতেও ত্রুটি করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন :—

“উহাতে গাম্ভীর্য্যের এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে এবং উহাতে অতি উন্নত ভাব সকল সময়ে পরিস্ফুট করা যায় কি না সন্দেহ। কিন্তু উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্ব্বজনমধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়; সে রচনা সুন্দরও হয় এবং যে সর্ব্বজনগ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার পক্ষে দুর্ল্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ। এই কথা জানিতে পারা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে অল্প লাভ নহে এবং এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতিশয়

দ্রুত চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের তুলাল'। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু 'আলালের ঘরের তুলালে'র পর হইতে বাঙ্গালী লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতার দ্বারা আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।"

অন্যত্র তিনি ইহা আরও সুস্পষ্ট করিয়াছেন :—

"হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই ; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই ; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য। ...টেকচাঁদি ভাষা হুতোমি ভাষার এক পৈঠা উপর। হাস্য ও করুণ রসের ইহা বিশেষ উপযোগী।...গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয়ে টেকচাঁদি ভাষায় কুলায় না। কেন না, এ ভাষাও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দুর্ব্বল এবং অপরিমার্জ্জিত।"

এইরূপ আলোচনার ফলে তিনি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন :—

"বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে এবং পড়িবা মাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য্য, সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য মিলাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য—সে স্থলে সৌন্দর্য্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়। প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্ ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্ত্তার ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চ ভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদি বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেব বাবু প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য্যসিদ্ধি না হয়, আরও উপরে উঠিবে ; প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই—নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি। বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে—যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরেজী, ফার্সী, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না। তারপর সেই রচনাকে সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট করিবে—কেন না, যাহা যাহা অসুন্দর, মনুষ্যচরিত্রের উপরে তাহার শক্তি অল্প। এই উদ্দেশ্যগুলি যাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় সিদ্ধ হয়, সেই চেষ্টা দেখিবে—লেখক যদি লিখিতে জানেন, তবে সে চেষ্টা প্রায় সফল

হইবে। আমরা দেখিয়াছি, সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী। কিন্তু যদি সরল প্রচলিত ভাষায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তবে কাজে কাজেই সংস্কৃতবহুল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে নিঃসঙ্কোচে সে আশ্রয় লইবে।”

যাঁহারা বিনা প্রয়োজনে সরল ভাষা বর্জ্জন করেন, তাঁহারাই নিন্দনীয়। সেই জন্যই তিনি সংস্কৃত-ব্যবসায়ী বাঙ্গালা লেখকদিগের নিন্দা করিয়াছেন :—

“অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণ সংসারের ধুতুরা ফল। বড় বড় লম্বা লম্বা সমাসে, বড় বড় বচনে তাঁহাদিগের অতি সুদীর্ঘ কুসুমসকল প্রস্ফুটিত হয়, ফলের বেলা কণ্টকময় ধুতুরা। …গুণের মধ্যে এই যে, এই ধুতুরায় মাদকের মাদকতা বৃদ্ধি করে। যে গাঁজাখোরের গাঁজায় নেশা হয় না, তাহার গাঁজার সঙ্গে দুইটা ধুতুরার বীচি সাজিয়া দেয়—যে সিদ্ধিখোরের সিদ্ধিতে নেশা না হয়, তাহার সিদ্ধির সঙ্গে দুইটা ধুতুরার বীচি বাটিয়া দেয়। বোধ হয়, সেই হিসাবেই বঙ্গীয় লেখকেরা আপনাপন প্রবন্ধমধ্যে অধ্যাপকদিগের নিকট দুই চারিটা বচন লইয়া গাঁথিয়া দেন। প্রবন্ধ-গাঁজার মধ্যে সেই বচন-ধুতুরার বীচিতে পাঠকের নেশা জমাইয়া তুলে।”

সরল প্রচলিত ভাষাও যে মার্জ্জিত হইলে শব্দশিল্পীর হস্তে শক্তিশালী ও সুন্দর হয়, তাহা আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় দেখিতে পাই।

রামরাম বসুর ‘লিপিমালা’ ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাহা যে উদ্দেশ্যে লিখিত, তাহা সরল প্রচলিত ভাষা ব্যতীত সিদ্ধ হইতে পারে না :—

“এ হেন্দুস্থান মধ্যস্থল বঙ্গদেশ কার্য্যক্রমে এ সময় অন্যোন্য দেশীয় ও ঔপদ্বীপীয় ও পর্ব্বতস্থ ত্রিবিধ লোক উত্তম মধ্যম অধম অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে এবং অনেক অনেকের অবস্থিতি ও এই স্থানে এখন এ স্থলের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা তাহারা এ দেশীয় চলন ভাষা অবগত নহিলে রাজক্রিয়া ক্ষম হইতে পারেন না ইহাতে তাহারদিগের আকিঞ্চন এখানকার চলন ভাষা ও লেখাপড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্ব্ববিধ কার্য্যক্ষমতাপন্ন হয়েন। এতদর্থে ভূমীয় যাবদীয় লেখাপড়ার প্রকরণ দুই ধারাতে গ্রথিত করিয়া লিপিমালা নাম পুস্তক রচনা করা গেল।”

এই ভাষায় প্রাণ ও সৌন্দর্য্য উভয়েরই একান্ত অভাব।

ডাক্তার উইলিয়ম কেরীর ‘ইতিহাসমালা’ ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উহার সপ্তম কথার আরম্ভ এইরূপ :—

“পদ্মাবতী নাম নগরীতে মুকুটমণি নামা এক রাজা থাকেন তিনি কৃষি বাণিজ্য প্রজাপীড়া হিংসাদি বিবিধোপায় দ্বারা অপরিমিত ধন সঞ্চয় করিয়া ও ধনাশা হইতে নিবৃত্ত

না হইয়া এক দিবস সভামণ্ডলীস্থ পণ্ডিতামাত্য প্রভৃতিকে কহিলেন যে ধনতুল্য কোন বস্তু নহে"—ইত্যাদি।

এই ভাষার দৈন্যও সপ্রকাশ।

বঙ্কিমচন্দ্র যে স্থানে সরল প্রচলিত ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, সে স্থানে তাহাই সুন্দর ও শক্তিশালী।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রবীন্দ্রনাথ চৈতন্য লাইব্রেরীর বিশেষ অধিবেশনে যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন (১৩০৯ বঙ্গাব্দ), তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন ঃ—

"মাতৃভাষার বন্ধ্যাদশা ঘুচাইয়া যিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) তাহাকে এমন গৌরবশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন তিনি বাঙ্গালীর যে কি মহৎ কি চিরস্থায়ী উপকার করিয়াছেন, সে কথা যদি কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয় তবে তদপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই।... তিনি আপনার শিক্ষাগর্ব্বে বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। একেবারেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। যত কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা সৌন্দর্য্য প্রেম মহত্ত্ব ভক্তি স্বদেশানুরাগ— শিক্ষিত পরিণত বুদ্ধির যত কিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজাত ধনরত্ন সমস্তই অকুণ্ঠিত ভাবে বঙ্গভাষার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরম সৌভাগ্যগর্ব্বে সেই অনাদরমলিন ভাষার মুখে সহসা অপূর্ব্ব লক্ষ্মীশ্রী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। তখন, পূর্ব্বে যাঁহারা অবহেলা করিয়াছিলেন, তাঁহারা বঙ্গ ভাষার যৌবনসৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া একে একে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন।"

যে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের "সুরুচির প্রতি শ্রদ্ধা এবং শ্লীলতা সম্বন্ধে অক্ষুণ্ণ বেদনা-বোধে"র প্রশংসা করিয়াছেন, তিনি কি একবার ভাবিয়া দেখিতে পারিয়াছিলেন—যে ভাষাকে আমরা মাতৃভাষা বলিয়া জননী সম্বোধন করি, তাঁহার সম্বন্ধে "বন্ধ্যাত্ব ঘুচানর", তাঁহার "যৌবনসৌন্দর্য্যে" লোককে আকৃষ্ট করার ও শ্রদ্ধা তাঁহার চরণে অর্পণ না করিয়া "হস্তে অর্পণের" কথায় কি সেই "সুরুচির প্রতি শ্রদ্ধা" ব্যক্ত হইয়াছে ?

তবে তাঁহার উক্তির ত্রুটিতে ব্যথিত হইলেও তাঁহার সহিত সকলেই স্বীকার করিবেন—বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গভাষার সেবা করিয়া বাঙ্গালীর মহৎ ও স্থায়ী উপকার করিয়াছেন এবং তিনি বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহের ভাবপ্রদর্শনের ধৃষ্টতা ঘৃণ্য মনে করিয়াছিলেন।

ভাষা-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনা কিরূপ কঠোর, তাহা তাঁহার পুস্তকগুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়—আর তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়, তিনি সর্ব্বত্র তাঁহার মতের—রচনার ভাষা বিষয়ানুসারেই নির্দ্ধারিত হইবে—অনুসরণ করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সেই মত অভ্রান্ত। তিনি ভাষা সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা করিয়া তবে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'র আরম্ভ এইরূপ ঃ—

"৯৯৮ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে

জাহানাবাদের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচলগমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেন না, সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর। কি জানি যদি কালধর্ম্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকাবৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে এই প্রান্তরে, নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবেক। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্য্যাস্ত হইল; ক্রমে নৈশ গগন নীল নীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমন ঘোরতর অন্ধকার দিগন্ত-সংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তিপ্রদর্শিত পথে কোন মতে চলিতে লাগিলেন।"

পরে ইহাতে ভাষা সম্বন্ধে "হইবেক" স্থানে "হইবে" করা হইয়াছিল। কিন্তু পাঠ করিলেই বুঝা যায়, ভাষা কেবল তাহার জড়ত্বশাপমুক্ত হইতেছে—মুক্তির আনন্দ ও স্বচ্ছন্দভাব তখনও লাভ করে নাই।

'কপালকুণ্ডলা' বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস। ইহা কাব্যের সৌন্দর্য্যে ওতঃপ্রোত। ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃতবহুল ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন এবং ইহার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্যই, তাহাতে লোকের অপ্রীতির উদ্রেক হয় নাই। ইহার ভাষার উদাহরণ:—

"পূর্ণচন্দ্রকরলেখা, অথবা হেমাম্বুদকিরীটিনী ঊষা যদি গৌরাঙ্গীদিগের বর্ণ-প্রতিমা হয়, তবে নববসন্ত-প্রসূত নবচূতদলরাজির শোভা এই শ্যামার বর্ণের অনুরূপ বলা যাইতে পারে।...মুখকান্তিমধ্যে দুইটি অনির্ব্বচনীয় শোভা; প্রথম সর্ব্বত্রগামিনী বুদ্ধির প্রভাব, দ্বিতীয় মহান্ আত্মগরিমা। তৎকারণে যখন তিনি মরালগ্রীবা বঙ্কিম করিয়া দাঁড়াইতেন, তখন সহজেই বোধ হইত, ইনি রমণীকুলরাজ্ঞী।"

ইহার পর 'মৃণালিনী'। এই পুস্তকে অপেক্ষাকৃত সরল ভাষাই ব্যবহৃত হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিয়াছিলেন,—ভাষার জন্য ইহা পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিতমুখে পাঠ করা যায় না।

'মৃণালিনী'র পর হইতে ভাষা উত্তরোত্তর সরল ও সবল হইয়াছে, তবে তাহা সর্ব্বত্রই বিষয়ভেদে ভিন্নরূপ—যে ভাবপ্রকাশের জন্য যে ভাষার প্রয়োজন তাহাই। 'দেবী চৌধুরাণী'তে সরল ভাষায় বর্ষাকালের জ্যোৎস্নামধুর রাত্রিতে ত্রিস্রোতার বর্ণনা অনিন্দ্য-সুন্দর:—

"বর্ষাকাল। রাত্রি জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না এখন বড় উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর, একটু অন্ধকারমাখা—পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মত। ত্রিস্রোতা নদী বর্ষাকালের জলপ্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীজলের স্রোতের উপর—স্রোতে আবর্ত্তে কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে জলিতেছে। কোথাও জল একটু ফুটিয়া উঠিয়াছে—সেখানে একটু চিকিমিকি। কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ হইতেছে, সেখানে একটু ঝিকিমিকি।

তীরে, গাছের গোড়ায় জল আসিয়া লাগিয়াছে—গাছের ছায়া পড়িয়া সেখানে জল বড় অন্ধকার। অন্ধকারে গাছের ফুল ফল পাতা বাহিয়া তীব্র স্রোত চলিতেছে, তীরে ঠেকিয়া জল একটু তর তর কল কল পত পত শব্দ করিতেছে—কিন্তু সে আঁধারে আঁধারে। আঁধারে আঁধারে সেই বিশাল জলধারা সমুদ্রানুসন্ধানে পক্ষিণীর বেগে ছুটিয়াছে। কূলে কূলে অসংখ্য কল কল শব্দ, আবর্ত্তের ঘোর গর্জ্জন, প্রতিহত স্রোতের তেমনি গর্জ্জন; সর্ব্বশুদ্ধ একটা গম্ভীর গগনব্যাপী শব্দ উঠিতেছে।"

'আনন্দমঠ' ইহারও পরবর্ত্তী রচনা। এই 'আনন্দমঠে'র আরম্ভ :—

"অতি বিস্তৃত অরণ্য। অরণ্যমধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল; কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও অনেক জাতীয় গাছ আছে। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেদশূন্য, ছিদ্রশূন্য, আলোক প্রবেশের পথমাত্রশূন্য, এইরূপ পল্লবের অনন্ত সমুদ্র, ক্রোশের পর ক্রোশ, ক্রোশের পর ক্রোশ, পবনের তরঙ্গের উপরে তরঙ্গবিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে। নীচে ঘনান্ধকার, মধ্যাহ্নেও আলোক অস্ফুট, ভয়ানক। তাহার ভিতরে কখন মনুষ্য যায় না। পাতার অনন্ত মর্ম্মর এবং বন্য পশুপক্ষীর রব ভিন্ন অন্য শব্দ তাহার ভিতর শুনা যায় না।

"একে এই বিস্তৃত অতি নিবিড় অন্ধতমোময় অরণ্য, তাহাতে রাত্রিকাল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। রাত্রি অতিশয় অন্ধকার, কাননের বাহিরেও অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না। কাননের ভিতরে তমোরাশি ভূগর্ভস্থ অন্ধকারের ন্যায়।

"পশুপক্ষী একেবারে নিস্তব্ধ। কত লক্ষ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পশু, কীট, পতঙ্গ সেই অরণ্যমধ্যে বাস করে। কেহ কোন শব্দ করিতেছে না। বরং সে অন্ধকার অনুভব করা যায়—শব্দময়ী পৃথিবীর সে নিস্তব্ধ ভাব অনুভব করা যাইতে পারে না। সেই অনন্তশূন্য অরণ্যমধ্যে সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধতামধ্যে শব্দ হইল, 'আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?'

"শব্দ হইয়া আবার সেই অরণ্যানী নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল; তখন কে বলিবে যে, এ অরণ্যমধ্যে মনুষ্যশব্দ শুনা গিয়াছিল? কিছুকাল পরে আবার শব্দ হইল, আবার সেই নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া মনুষ্যকণ্ঠ ধ্বনিত হইল,—'আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?'

"এইরূপ তিনবার সেই অন্ধকারসমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল, 'তোমার পণ কি?'

"প্রত্যুত্তরে বলিল, 'পণ আমার জীবন সর্ব্বস্ব।'

"প্রতিশব্দ হইল, 'জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।'

" 'আর কি আছে? আর কি দিব?'

"তখন উত্তর হইল—'ভক্তি' !"

'সীতারাম' 'দেবী চৌধুরাণী'রও পরের রচনা। কিন্তু এই 'সীতারামে' বঙ্কিমচন্দ্র যখন স্বজাতির পূর্ব্ব-গৌরব স্মরণ করিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তখন ভাষা বিষয়োচিত গাম্ভীর্য্য ধারণ করিয়াছে :—

"পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনাবন্ধনে যে গাথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তরমূর্ত্তি সকল যে ক্ষোদিয়াছিল—সেই দিব্যপুষ্পমাল্যাভরণভূষিত, বিকল্পিতচেলাঞ্চলপ্রবৃদ্ধসৌন্দর্য্য, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান সম্মিলনস্বরূপ পুরুষমূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এইরূপ কোপপ্রেমগর্ব্বসৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা, চীনাম্বরা, তরলিতরত্নহারা, পীবরযৌবনভারাবনতদেহা—তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভি ; এই সব স্ত্রীমূর্ত্তি যারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল, উপনিষদ্, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক, এ সকলই হিন্দুর কীর্ত্তি—এ পুতুল কোন্ ছার। তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।"

শেষ পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র ভাষা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন। তাঁহার শেষ উপন্যাস 'রাজসিংহ' (পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ)। উহার বিজ্ঞাপনের শেষভাগে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"এখন লেখকেরা বা ভাষাসমালোচকেরা দুই ভাগে বিভক্ত। এক সম্প্রদায়ের মত যে, বাঙ্গালা ব্যাকরণ সর্ব্বত্র সংস্কৃতানুযায়ী হওয়া উচিত। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মত—তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃতে সুপণ্ডিত—যে, যাহা পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণ বিরুদ্ধ হইলেও চলিতে পারে। আমি নিজে এই দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মতের পক্ষপাতী কিন্তু সম্পূর্ণরূপে এবং সকল স্থানে তাঁহাদের অনুমোদনে প্রস্তুত নহি। আমি যদিও ইতিপূর্ব্বে সম্বোধনে 'ভগবন্', 'প্রভো', 'স্বামিন্', 'রাজকুমারি', 'পিতঃ' প্রভৃতি লিখিয়াছি, এক্ষণে এ সকল বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রযোজ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। 'তথা' এবং 'তথায়' উভয় রূপই ব্যবহার করিয়াছি। 'সসৈন্যে' এবং 'সসৈন্য' দুই-ই লিখিয়াছি একটু অর্থভেদে। কিন্তু 'গোপিনী' 'সশরীরে উপস্থিত' এইরূপ প্রয়োগ পরিত্যাগ করিয়াছি। কারণ নির্দ্দেশের এ স্থান নহে। সময়ান্তরে তাহা করিব ইচ্ছা আছে।"

আমাদিগের দুর্ভাগ্য তিনি আর সে ইচ্ছা পূর্ণ করিবার সময় পান নাই। বিশেষ দুর্ভাগ্যের কারণ এই যে, বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা ভাষা লইয়া যেরূপ ব্যবহার চলিতেছে, তাহাকে ভাষার প্রতি অত্যাচার ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারি না। যখন সেই সব

অত্যাচার লক্ষ্য করি, তখন 'বঙ্গদর্শনে'র যুগের সাহিত্যের কথা স্মরণ করিয়া কালিদাসের সেই কথা—অজপরিত্যক্ত অযোধ্যার বর্ণনা মনে পড়ে :—

"নিশাসু ভাস্বৎ কলনূপুরাণাং
যঃ সঞ্চরোঽভূদভিসারিকাণাম্।
নদন্মুখোল্কাবিচিতামিষাভিঃ
স বাহ্যতে রাজপথঃ শিবাভিঃ ॥"

যে পথে প্রমদাকুল চলিত নিশায়,
মুখর নূপুর চারু বাজিত চরণে,
আপনার পথ হেরি' মুখের উল্কায়—
তথায় শৃগাল ঘুরে আমিষান্বেষণে।

কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ এক দিন মিল্টনকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন—মিল্টনের সেই সময় জীবিত থাকা ইংলণ্ডের পক্ষে প্রয়োজন ছিল। তেমনই আমরা আজ বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশে বলি—আজ যদি তিনি জীবিত থাকিতেন, তবে কেহ ভাষার উপর এইরূপ অত্যাচার করিতে পারিতেন না। কারণ, তিনি স্রষ্টা ও শাসক—একাধারে উভয়ই ছিলেন।

রজনীকান্ত গুপ্ত লিখিয়াছেন :—

"ভাষার পবিত্রতা রক্ষা করা বঙ্কিমচন্দ্রের যেমন কর্ত্তব্য ছিল, ভাষাকে সাধারণের বোধগম্য করাও তাঁহার সেইরূপ একটি গুরুতর কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার এই গুরুতর কর্ত্তব্য অসম্পন্ন থাকে নাই। তিনি অসামান্য প্রতিভাবলে আপনার সেই সাধনায় সর্ব্বাংশে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।...বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা যে ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা নিম্নস্তর অতিক্রম করিয়া উচ্চস্তরে উত্থিত হইলেও জীবনীশক্তি বিসর্জ্জন দেয় নাই। গাম্ভীর্য্যের সহিত কোমলতার, দুরূহ শব্দাবলীর সহিত সরল শব্দমালার ও ওজস্বিতার সহিত প্রাঞ্জলতার সমতা রক্ষা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গীয় ভাষাকে স্বতন্ত্র পথে পরিচালিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ভাষা গম্ভীর হইয়াও কোমল, সংস্কৃত শব্দাবলীতে গ্রথিত হইয়াও প্রাঞ্জল, নিত্যব্যবহার্য্য চিরপ্রচলিত কথার আশ্রয়স্থল হইয়াও গ্রাম্যতা-হীন।"

এই ভাষার স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র সতর্কতা সহকারে ভাষার প্রতি অত্যাচার নিবারণ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার সৃষ্ট বঙ্কিম-মণ্ডলের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন, তাঁহাদিগের রচনার আদর্শ তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। তিনি ভাষার বিশুদ্ধি নিষ্ঠাসহকারে রক্ষা করিতেন—যাহারা সে বিশুদ্ধি নষ্ট করিত, তাহারা তাঁহার আক্রমণভয়ে পলায়ন করিত। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"বঙ্কিম নিজে বঙ্গভাষাকে যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন অন্যেও তাহাকে

সেইরূপ শ্রদ্ধা করিবে ইহাই তিনি প্রত্যাশা করিতেন।...বঙ্গভাষা আর্ত্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে, সেখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজমূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছেন।"

আজ আমরা—যাহারা তাঁহার শিষ্য বলিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করি—আমরা তাঁহাকে সেই প্রসন্ন চতুর্ভুজমূর্ত্তিতেই ধ্যান করি; প্রার্থনা করি, তিনি বাঙ্গালা ভাষাকে ও বাঙ্গালা সাহিত্যকে সর্ব্ববিধ অনাচার ও অত্যাচারের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে অভয় ও তাহার উন্নতির জন্য তাহাকে বর দান করুন; তাঁহার মুখমারুতে পূর্ণ হইয়া তাঁহার শঙ্খ বাঙ্গালায় প্রণাদ করুক, তাঁহার চক্র বাঙ্গালার সকল অমঙ্গল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করুক; তাঁহার গদা অনাচারীকে বিনষ্ট করুক, তাঁহার পদ্ম বাঙ্গালা ভাষায় ও সাহিত্যে অম্লান শোভা প্রদান করুক।

যিনি বাঙ্গালা-সাহিত্যিকদিগের গুরু; যিনি ভগীরথের মত সাধনা করিয়া ভাব-মন্দাকিনীধারায় আমাদিগের বাঙ্গালা সাহিত্যকে নবজীবনে সঞ্জীবিত করিয়া তাহাকে বিশ্ববরেণ্য করিয়া গিয়াছেন; যিনি সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি—নানা দিক্ আপনার প্রতিভার আলোকে উজ্জ্বল করিয়া এই দেশে মহাভারতের স্রষ্টা পূর্ণমানব শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ স্থাপিত করিয়াছেন; যিনি ভারতবাসীকে জন্মভূমির দেবীমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন; যিনি হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া মনে করিয়াছেন—হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছেন এবং হিন্দুকে হিন্দু রক্ষা না করিলে আর কেহ করিবে না বলিয়া হিন্দুকে স্বাবলম্বনের অনুশীলন করিতে উপদেশ দিয়াছেন; যিনি বুঝাইয়াছেন, কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম অভিন্ন এবং কর্ম্মব্যতীত ধর্ম্ম হয় না; যিনি কর্ম্মযোগীর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুযুধান কৌরব ও পাণ্ডবীয় চমূর মধ্যে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের সেই কথা এ দেশের লোককে স্মরণ করিতে বলিয়াছেন—"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে"; যাঁহার বহু দানের মধ্যে উন্নতির পথারূঢ় "মাতৃসম মাতৃভাষা" অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান; যিনি বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে সর্ব্বশাস্ত্রসার ভগবদ্গীতা অধ্যয়নের হেতু; যিনি বুঝাইয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালীর গৌরব করিবার অনেক কারণ আছে; যিনি বাঙ্গালীকে মনে করিতে শিখাইয়াছেন—"আমি কেবল দেশকে মা বলিয়াছি, আর কাহাকেও মা বলি নাই; কেন না, এই সুজলা সুফলা ধরণী ভিন্ন আমরা অনন্যমাতৃক"; যাঁহার দৃষ্ট মহামন্ত্র "বন্দে মাতরম্" লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক সযত্নে ও শ্রদ্ধা সহকারে ছত্রপতি শিবাজীর সমাধিতোরণে উৎকীর্ণ করিয়াছেন; যিনি এ দেশের অধিবাসীদিগকে—তাঁহার হিন্দুস্থানে জ্ঞানানুশীলনে আত্মনিয়োগকারী সমুন্নত সম্প্রদায়ে জন্মের অধিকারে ও আপনার অসামান্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বহেতু মাতৃমন্ত্রে দীক্ষাদান করিবার জন্য শত বর্ষ পূর্ব্বে এই দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—আজ আমরা সেই মহাপুরুষকে স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রদত্ত মহামন্ত্র জপ করি—

"বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।"

আমরা মনোমন্দিরে মার মন্দির রচনা—তাহাতে মার প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া ভক্তির অর্ঘ্য তাঁহার চরণে অর্পণ করি; দেশের গগন পবন মুখরিত করিয়া মাতৃমন্ত্র ধ্বনিত—প্রতিধ্বনিত হউক—

বন্দে মাতরম্।

বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

বঙ্গের সাহিত্যাকাশে অপূর্ব্ব ভাস্বর—
যা-কিছু মঙ্গলধর্ম্মী সত্য ও সুন্দর,
বঙ্কিম তাহারি নাম। জ্ঞান ও কল্পনা—
যুগ্মপাণি নিত্য যেবা করিয়া বন্দনা
বাণীর মন্দির তলে, অতন্দ্র নিষ্ঠায়,
লভিলা মন্ত্রের সিদ্ধি ইষ্ট সাধনায়।
বঙ্গভাষা গঙ্গাসম স্নিগ্ধ পূত ধারে
স্বচ্ছন্দ জীবন লভি' রসের পাথারে
মিশে যার ভাগীরথী পুণ্য তপস্থায়,
সেই ত বঙ্কিমচন্দ্র স্বষ্টির পৃষ্ঠায়।
ধর্ম্ম যার মর্ম্মকথা, কর্ম্ম যার বাণী,
বক্ষে প্রেম, চক্ষে ক্ষেম, সব্যসাচী পাণি,—
বঙ্গের বঙ্কিম সেই শাশ্বত সুপ্রিয়,
সে শুধু সম্রাট্ নয়—সে যে অদ্বিতীয়!

বঙ্কিম-সাহিত্যের রস-বিচার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগের লোক সে যুগ গত হইয়াছে, সে সাহিত্যও এখন অচল—যুগের সঙ্গে সাহিত্যও কালের কুক্ষিগত হইয়াছে, এ বিষয়ে আধুনিক-সাহিত্যের সম্রাট্‌ হইতে ক্ষুদ্রতম ভৌমিক পর্য্যন্ত কাহারও মতভেদ নাই। যেহেতু উনবিংশ শতাব্দী বিংশ শতাব্দীর অগ্রবর্ত্তী নয়,—পূর্ব্ববর্ত্তী, সেই হেতু সে যুগের সকল কীর্ত্তিই এক্ষণে গলিত ফলের মত মাটি হইয়া গেছে—ইহাই প্রগতিবাদের অবশ্যস্বীকার্য্য সিদ্ধান্ত। আমার মনে হয়, এইরূপ মনোভাবের ফলেই বাংলা দেশের আধুনিক পণ্ডিতগণ, পুরাতনের উপরে আধুনিকের, এবং আধুনিকের উপরে অতি-আধুনিকের স্থান নির্দ্দেশ করিতে এত ব্যগ্র; এবং ইহারই ফলে ইতিমধ্যেই রবীন্দ্রনাথের উপরেও পর্দ্দা টানিয়া দিবার ভাব দেখা যাইতেছে। এ-হেন কালে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কোনও আলোচনা অতিশয় অসাময়িক বলিয়াই মনে হয়, অনেক কৈফিয়ৎ দিয়াও মুখরক্ষা করা কঠিন। তথাপি আমি বঙ্কিম-সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে মনস্থ করিয়াছি; বঙ্কিম-সাহিত্যকে কোন্‌ দিক দিয়া বিচার করিলে, আধুনিক রুচি ও রসবোধ ক্ষুণ্ণ হইলেও, সাহিত্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা নাই, আমি তাহাই ভাবিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিব।

ক্রমোন্নতিই যে সৃষ্টির একমাত্র নিয়ম, কাল যতই অগ্রসর হইতেছে মানুষও যে ততই উন্নত হইতেছে—না হইয়া পারে না, এইরূপ একটা বৈজ্ঞানিক মনোভাব আজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কোনও চিন্তা, কোনও ভাব—এমন কি, কোনও কারুসৃষ্টির কালনিরপেক্ষ মূল্য নাই—কালস্রোতের ঘূর্ণাবর্ত্ত যেমন স্থিরকেন্দ্রিক নয়, তেমনই মানুষের অন্তরেও কোন-কিছুর ধ্রুবচ্ছায়া প্রতিফলিত হইতে পারে না—এই তত্ত্ব এ যুগের মানুষকে সর্ব্ববিষয়ে অবিশ্বাসী করিয়াছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই অনিত্যের উপাসনা চলিয়াছে; সেখানেও সকল সৃষ্টিই ক্ষণিক, পূর্ব্বক্ষণকে পরক্ষণ স্বীকার করে না, এবং প্রগতিবাদের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য, যাহা পরবর্ত্তী তাহা অগ্রবর্ত্তী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ইহা প্রমাণ করিতেই হয়।

কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি আর যে ক্ষেত্রেই যথার্থ হউক, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না, দিলে সত্যভ্রষ্ট হইতে হয়। সাহিত্যের জগৎ ও যথাপ্রাপ্ত জগৎ এক নয়; একটি—দেশে ও কালে বিবর্ত্তিত হইতেছে, অপরটি—দেশকালকে আশ্রয় করিয়াও

যে পরিমাণে তাহা হইতে মুক্ত, সেই পরিমাণেই তাহা উৎকৃষ্ট সাহিত্য-পদবীতে আরোহণ করে। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড—শেক্‌স্পীয়ার, কালিদাস, গেটে—বিশ্বসাহিত্যের এই সকল প্রকাশ দেশকাল-সম্পর্কিত হইলেও ক্রমবিকাশ বা প্রগতিবাদের প্রমাণ নহে—জাগতিক কার্য্যকারণতত্ব বা বৈজ্ঞানিক মতবাদ এই ঘটনাগুলি সম্যক ব্যাখ্যা করিতে পারিবে না। যাঁহারা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রয়োজনে সাহিত্যিক রূপ-বিবর্ত্তনের একটা কালক্রম, অথবা কবিকল্পনার নানা ভঙ্গির একটা ঋতুপর্য্যায় আবিষ্কার করিয়া, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা চরিতার্থ করেন, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের কেরানি মাত্র—তাঁহারা সাহিত্য-পণ্ডিত হইতে পারেন, সাহিত্য-রসিক নহেন ; কারণ, সাহিত্যের যাহা সার অংশ তাহার ইতিহাস নাই, কালপ্রবাহে যে ক্ষণগুলি পরস্পরকে দ্রুত অনুধাবন করিয়া চলিয়াছে, এবং যাহাদের মধ্যে একটা পৌর্ব্বাপর্য্য বা ক্রমশৃঙ্খলা আছে, সেইরূপ কোনও ক্ষণ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের জন্মক্ষণ নহে ; সে সাহিত্যের জন্ম হয় মাহেন্দ্রক্ষণে, এবং যিনি তাহার স্রষ্টা তিনিও ক্ষণজন্মা।

অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ যে অর্থে বিগত হইয়াছে, বঙ্কিম-সাহিত্য সে অর্থে বিগত হয় নাই ; বরং আজিকার বাংলা সাহিত্যের যে অবস্থা—রবীন্দ্রনাথের মত ঐরাবতও যে অবস্থায় স্রোতোমুখে নিরুপায়ভাবে ভাসিয়া চলিয়াছেন—সেই অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্রকে সেকাল হইতে একালে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, এই মৃতকল্প সাহিত্যের বলাধান হইতে পারিত ; কিন্তু সে সম্ভাবনা ক্রমেই সুদূরপরাহত হইয়া পড়িতেছে। আমি যে ক্ষণজন্মা পুরুষের কথা বলিয়াছি, বাংলা সাহিত্যে সেইরূপ ক্ষণজন্মা পুরুষ যে কয়জন জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এ কথা আজিও জাত-সাহিত্যিক ছাড়া সকল শিক্ষিত ও ধর্ম্মজ্ঞান-সম্পন্ন বাঙ্গালীই স্বীকার করিবে।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, খুব বড় যে সাহিত্য, তাহা কালস্রোতের উর্দ্ধে বিরাজ করে ; কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও সত্য যে, সকল সাহিত্যই দেশ কাল ও জাতির বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় আত্ম-প্রকাশ করে। কবিমানসের যে উপলব্ধি, তাহা এমনই পূর্ণ ও প্রত্যক্ষ যে, দেশ কাল জাতির বিশিষ্ট লক্ষণ তাহার বাধা না হইয়া, তাহাকে রূপ দিবারই সহায়তা করে। সেই রূপের যে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য তাহা বাহিরের এই উপাদানের জন্যই ঘটে—এবং কবির অন্তরস্থ প্রেরণা এতই উজ্জ্বল যে, ভাব ও এই রূপের মধ্যে কোনও বিরোধ ঘটে না। এইরূপ পূর্ণদৃষ্টিসম্পন্ন প্রতিভার যাহা কিছু রচনা, সকলের মধ্যে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এমন একটি সুসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায় যে, মনে হয়, এই ব্যক্তি যেন কোন্ পরমক্ষণে বিদ্যুদ্দীপ্তির মত একটা কিছুকে সমগ্রভাবে লাভ করিয়াছে—তারপর তাহার সেই উপলব্ধির যত কিছু বিচিত্র বাণীসৃষ্টি, তাহা সেই কেন্দ্রগত জ্যোতির্বিন্দুকে আশ্রয় করিয়াই মণ্ডলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা সাহিত্যে এইরূপ স্বপ্রতিষ্ঠ ও সম্যক্‌দ্রষ্টা কবিমনীষী এ পর্য্যন্ত একটিরই আবির্ভাব ঘটিয়াছে—

সে প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় আমরা এখনও পাই নাই ; সে পরিচয় একবার রীতিমত আরম্ভ হইলে কখনও শেষ হইবে না—বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগের প্রবর্ত্তক, সে যুগ বাঙালী জাতির ভবিষ্যতের বীজরূপে এখনও কালগর্ভে নিহিত আছে।

আজ বিংশ শতাব্দীর এই যুগে বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমের পরিচয় কি ? বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার প্রথম ঔপন্যাসিক, সেকালের সেই অপরিপুষ্ট সাহিত্যের অতিশয় সংকীর্ণক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাসে যৎকিঞ্চিৎ রসসৃষ্টির পরিচয় আছে ; সার্ ওয়াল্টার স্কটের উপন্যাসাবলীর মতই সেগুলি অল্পবয়স্ক পাঠকপাঠিকার মনোরঞ্জন করিতে পারে,—হয়তো তাহাও পারে না ; কারণ, আজকালকার অল্পবয়স্ক পাঠকপাঠিকারাই সাহিত্যরসে অধিকতর প্রবীণ। একালের যে তিন জন মহাপ্রতিভাশালী লেখকের মতামত সাহিত্যিক মাত্রেই শিরোধার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নানা সময়ের নানা উক্তি এইরূপ ধারণারই সমর্থন করে। ইহাদের মধ্যে একজন, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পূর্ব্বসূরিগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথকে ও পরবর্ত্তীরূপে আপনাকে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এ সমাজে বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে বলিতে যাওয়া নিতান্তই পক্ষসমর্থনের মত হয় ; বর্ত্তমান লেখকের পক্ষে সেরূপ কাজ আদৌ রুচিকর নহে। একালে রুচি ও রসবোধের যে বিকাশ, এবং সাহিত্য-সমালোচনার যে পদ্ধতি দেখা যাইতেছে—বড় বড় পণ্ডিতগণ যে ভাবে এই রুচির জয় ঘোষণা করিতেছেন, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্র কেন, যে কোনও শক্তিমান লেখকের সম্বন্ধে সাহিত্য-নীতিসম্মত আলোচনা দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কীর্ত্তি যে তাঁহার উপন্যাস, তাঁহার প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় যে তাহাতেই আছে—অর্থাৎ এই উপন্যাসগুলির মূল্যেই তাঁহার কবিপ্রতিভার মূল্য নির্ণয় করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি, ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র কেবল উপন্যাস-লেখকই নহেন। স্কট, জর্জ এলিয়ট, ডিকেন্স, থ্যাকারে, মেরিডিথ, হার্ডির সঙ্গে তুলনা করিয়া, অথবা আধুনিক বাংলা উপন্যাসের নবতন আদর্শ ও নব্যতম ভঙ্গিমার মাপকাঠিতে যাচাই করিয়া লইলেই ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের পরিচয় সম্পূর্ণ হইবে না। ঐতিহাসিক উপন্যাস, নভেল, রোমান্স প্রভৃতির আকৃতি-প্রকৃতি এবং ঐ জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাস প্রভৃতির সূত্র ধরিয়া, কতকগুলি বাঁধা ফরম্যুলার সাহায্যে, বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যকাব্যগুলিকে কেবল পুঁথি-পড়া করিয়া বিদায় করিলেই চলিবে না। কারণ, ইহাই আধুনিক সমালোচনাশাস্ত্রের নীতি যে, উৎকৃষ্ট মৌলিক সৃষ্টির জাতিবিচার চলে না ; তাহার যে জাতি সে তাহারই, আর কাহারও সহিত তাহার জাতি-সম্পর্ক নাই ; তাহাকে বিচার করিতে হইবে তাহারই আদর্শে। অতএব, বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস লিখিয়াছেন, সেই হেতু তিনি ঔপন্যাসিক, তাঁহার গ্রন্থগুলিতে উপন্যাস-রসরসিক পাঠকের রুচি, ও কলাকুতূহলী

চিত্ত কতখানি তৃপ্তি পায়, ইহাই দেখিতে হইবে, তাহার অতিরিক্ত কোনও কথাই অবান্তর এমন পণ করিয়া বসিলে, বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে সকল আলোচনাই নিষ্ফল হইবে। উপন্যাস তো সকলেই লেখে, আজকাল রামা-শ্যামাও উপন্যাস লিখিতেছে, এবং প্রায় সকলেই, অন্তত বঙ্কিমের চেয়ে, বড় আর্টিস্ট। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ হইতে কলেজের অধ্যাপক পর্য্যন্ত সকলেরই এই মত; সাহিত্যিক প্রগতিবাদীরা যে সকল প্রতিভার আগমনী-গান করিতেছেন, এবং তাহার ফলে সাহিত্যের যে স্টাইল, ও উপন্যাসের যে আদর্শ জয়যুক্ত হইতেছে, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রকে ঔপন্যাসিক নামে অভিহিত করিতে কুণ্ঠা বোধ হওয়াই স্বাভাবিক। আধুনিক সমালোচনার এই প্রবৃত্তি দেখিয়াই আমাকে এ বিষয়ে সাবধান হইতে হইয়াছে।

আমি জানি, এ কথা অনেকের মনঃপুত হইবে না, এজন্য আমার বক্তব্য আর একটু ব্যাখ্যা করিয়া বলা প্রয়োজন। বঙ্কিম-প্রতিভার সাহিত্যিক বিচারই আমারও অভিপ্রায়, সে বিচারে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান এতটুকু নামিয়া যাইবে না; আমিও কবি-বঙ্কিমের কথাই বলিতে চাই। বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিকই বটেন, কিন্তু তাঁহার সেই উপন্যাসের প্রেরণা অতিশয় স্বতন্ত্র; সেই প্রেরণার দিক দিয়া না দেখিয়া—কেবলমাত্র একটা বিশিষ্ট সাহিত্য-কলার দিক দিয়া দেখিলে, তাহার রসাস্বাদনেও যেমন বাধা ঘটিবে, তেমনই একজন বিশিষ্ট কবি-ব্যক্তির ব্যক্তি-মানসের সহিত পরিচয় করা যাইবে না।

ইংরেজীতে একটি কথা আছে—'style is the man'—কথাটা একজন বিখ্যাত ফরাসী-লেখকের সৃষ্টি, এই কথাটিই আধুনিক সাহিত্য-সমালোচনায় সর্ব্বপ্রথম যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মত বঙ্কিম-সাহিত্য সম্বন্ধেও এই উক্তি সত্য—এবং অতিশয় যথার্থভাবে সত্য। প্রত্যেক সাহিত্য একটি বিশিষ্ট সাহিত্য, তাহার বাণী তাহারই। এই বাণী-কথাটিও বাংলায় একটু বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিলে ভাল হয়। প্রথমত—ভাষা অর্থেই বাণী নয়; আবার অধুনা-প্রচলিত অর্থে বাণী বলিতে যাহা বুঝায় তাহাও নয়; অর্থাৎ, কোনও মত, উপদেশ বা মূল্যবান উক্তি নয়। ভাব যখন ভাষায় রূপপরিগ্রহ করে, তখনই তাহাকে বাণী নাম দিব। ভাবের এই যে বাঙ্ময় রূপ বা বাণী—ইহা সম্ভব হয় যখন সেই ভাব ব্যক্তিবিশেষের ভাব—অতিশয় মৌলিক ও স্বতন্ত্র; এই বাণী ব্যক্তিরই আত্মপ্রকাশ—ইহারই নাম স্টাইল। এক ব্যক্তির যে বাণী, তাহার বিস্তার ও বৈচিত্র্য যেমনই হউক, তাহা সর্ব্বত্র এক—তাহার সমগ্র রচনাই একই ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ। এক ভাষার সাহিত্যে এইরূপ বহু বাণী থাকে—প্রত্যেকটি এক একটি স্বতন্ত্র স্টাইল, এক একটি ব্যক্তি। সেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যদি পূর্ণবিকশিত হইয়া থাকে, তাহার সমস্ত ভাব চিন্তা কল্পনা যদি সেই একটা ব্যক্তি-কেন্দ্রে সুসমাহিত হইয়া থাকে, তবে তাহার সকল রচনায় সেই এক স্টাইল পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে, তাহার সেই মানস-পদ্মের দলবিস্তারে কেন্দ্রটি

হারাইয়া যাইবে না ; পুষ্প যতই নব নব দলে বিকশিত হউক, তাহা সেই বৃন্তটিরই চতুষ্পার্শে মণ্ডলায়িত হইয়া উঠিবে। এই জন্য উৎকৃষ্ট প্রতিভার যাবতীয় বাণী—সেই একই ব্যক্তির—একই ভাবের প্রকাশ, এবং তদ্‌রচিত সমগ্র সাহিত্যকে একটি স্টাইল বলিতে হইবে।

এই অর্থে যে স্টাইল, তেমন স্টাইল বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমের তুল্য আর কুত্রাপি নাই। অন্যান্য ছোট-বড় লেখকের লেখায় যে ধরণের ব্যক্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, তাহা অনেক সময়ে একটা বহির্গত বস্তু ; তাহার পরিধিও যেমন সংকীর্ণ, তেমনই তাহাকে একটি বিশিষ্ট টেক্‌নিকভঙ্গি বলা যাইতে পারে। যে ব্যক্তিত্বের কথা আমি উপরে বলিয়াছি, সেই ব্যক্তিত্বের মূল গ্রন্থি খুব বড় লেখকের সাহিত্য-সৃষ্টিতেও বার বার ছিঁড়িতে ও নূতন করিয়া জোড়া লাগিতে দেখা গিয়াছে—লেখক যেন তাঁহার জীবনে কখনও আত্মস্থ হইতে পারেন নাই। যাঁহারা সাহিত্য-কলা-বিলাসী, তাঁহাদের এই personality অতিশয় দুর্ব্বল, নানা রং, রূপ ও আলোর নিত্য নব আকর্ষণে তাঁহাদের আত্মা বিক্ষিপ্ত ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। ভাবের পরিধি যদি সংকীর্ণ হয় তাহা হইলে এক প্রকার ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয় বটে, কিন্তু ভাবের লীলা যদি অফুরন্ত হয় তাহা হইলে তাহার মূল গ্রন্থি যেমন শিথিল হইয়া যায়, তেমনই সে প্রতিভা আপন ব্যক্তিত্বকে বার বার খণ্ডিত করে। বঙ্কিম-সাহিত্যের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটি ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ভাবের বিচিত্র ও পূর্ণতম বিকাশ সুস্পষ্ট হইয়া আছে ; তাঁহার সর্ব্ববিধ রচনার মধ্যে সেই এক ব্যক্তি, এক স্টাইল জাজ্বল্যমান—বঙ্কিম নামক ব্যক্তি-কেন্দ্রে একটি ভাবজগৎ সকল দিকে পূর্ণমণ্ডলায়িত হইয়া রহিয়াছে। এই ব্যক্তিগত অথচ সমগ্র-দৃষ্টিই তাঁহার প্রতিভার অনন্যসাধারণ লক্ষণ ; ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, এবং 'কৃষ্ণচরিত্র', 'ধর্ম্মতত্ত্ব' ও 'সাম্যে'র বঙ্কিমচন্দ্র এক ব্যক্তি। জীবনকে খণ্ডিত করিয়া তাহার অংশবিশেষে সাহিত্যিক কলা-কুতূহলতৃপ্তি সে প্রতিভার প্রবৃত্তি নহে। এই জন্যই আমি স্টাইল কথাটা লইয়া এতক্ষণ যে আলোচনা করিলাম, তাহা এই প্রসঙ্গে অবান্তর নহে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভা যে কোন্ শ্রেণীর তাহা বুঝিতে হইলে আর একটা কথাও এই স্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমরা আজকাল যাহাকে আর্ট বলি—যে সাহিত্য-নীতির দোহাই দিয়া থাকি এবং যাহার অনুশাসনে, এক দিকে যেমন রোমান্টিকের উপরে রিয়ালিষ্টিকের জয়ঘোষণা করি, এবং অপর দিকে সাহিত্য হইতে সর্ব্ববিধ আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠাকে বহিষ্কার করিতে চাই, সেই আর্ট প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যকে খর্ব্ব করে—সাহিত্যে মানব-চৈতন্যের পূর্ণ অভিব্যক্তির বাধা হইয়া দাঁড়ায়। জীবনই সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য, সেই জীবনের কোনও রূপ যখন বাণী হইয়া উঠে তখনই তাহা সাহিত্য হয়, প্রথমে ইহাই হওয়া চাই। পরে আমরা যখন সেই বাণীরূপের কৌশল পৃথকভাবে লক্ষ্য করিতে পারি, তখন আর্ট সম্বন্ধে সজ্ঞান হই—আর্ট আগে, পরে সাহিত্য নয়। জীবনকে

যে দেখে নাই, সে সাহিত্যে সেই জীবনের প্রকাশকে বুঝিবে কেমন করিয়া? স্টাইলেরই বা সে কি বুঝিবে? কতকগুলি সুপরিচিত, সহজবেদ্য emotion-কে কলা-কৌশলে বাণীরূপ দিবার শক্তিই শ্রেষ্ঠ প্রতিভার লক্ষণ নয়; জীবনের একটা খণ্ডকে লইয়া যে সাহিত্য রচিত হয়, তাহা good art হইতে পারে—great art নয়; এবং জীবন বলিতে যতদূর সম্ভব একটা সমগ্র ভাব বা সমগ্র দৃষ্টির কথাই মনে রাখিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার মত করিয়া, তাঁহারই দৃষ্টিদ্বারা, এই জীবনের একটা সমগ্র রূপ কল্পনা করিয়াছিলেন, এবং সে কল্পনা বাস্তবের সহিতই বোঝাপড়া করিতে চাহিয়াছিল। জীবনের খণ্ড-সমস্যা নয়—আজকাল যাহাকে সমস্যা বলা হয় সেই সমস্যা নয়—তাঁহার ভাব-কল্পনার পরিধিতে যে সমগ্র বাস্তব বৃহৎরূপে প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া একটি সুসমঞ্জস রূপে পুনঃসৃষ্টি করিয়াছিলেন—তাঁহার সমগ্র সাহিত্য ইহারই প্রকাশ। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও সজ্ঞান আর্ট-সাধনা ছিল না; জীবনকে উপেক্ষা করিয়া কেবল তাহার খণ্ড রূপের রসোদ্ঘাটনই তাঁহার সাহিত্যিক ধর্ম্ম ছিল না। জীবন ও জগতের যে রূপ তিনি আত্মগোচর করিয়াছিলেন, তাহাই বীজরূপে তাঁহার কল্পনায় অঙ্কুরিত হইয়া সপল্লব শাখা-কাণ্ডে একটি বৃহৎ সুঠাম বৃক্ষের আকার ধারণ করিয়াছিল; এই বৃক্ষের মূল কুত্রাপি মৃত্তিকার আশ্রয় ত্যাগ করে নাই, ইহার শীর্ষদেশ উর্দ্ধমুখী হইলেও কখনও শূন্য ব্যোমকে আকাঙ্ক্ষা করে নাই। তিনি সেই জীবনকে যে কাব্যগুলিতে প্রতিফলিত করিয়াছেন, তাহারা romanticও নয়, realisticও নয়—পুরুষের প্রবুদ্ধ চেতনায় বাস্তবের যে সর্ব্বাঙ্গশোভন রূপ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব, তাহারই একটি ব্যক্তিস্বতন্ত্র ভঙ্গি সেগুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র জীবনকে অতিশয় বাস্তবরূপেই দেখিয়াছিলেন—রসব্রহ্মের সাঙ্কেতিক প্রকাশরূপে নয়, নীতিনিয়মহীন জড়বাস্তবরূপেও নয়। তাঁহার জগৎ যেমন প্রত্যক্ষ, তেমন জীবন্ত। সে জগৎ সুন্দর বলিয়াই তাহার মূলে একটা নীতি বা ধর্ম্ম আছে, কারণ নীতিই সকল সৌন্দর্য্য, সকল মহিমা ও সুষমার নিদান। এই নীতির উর্দ্ধে আর কিছুকে স্থাপন করিবার প্রয়োজনও নাই—সেই নীতির পূর্ণ লীলার বিগ্রহ যে মানুষ, তাহাকে অতিক্রম করিয়া কোনও অলৌকিক সত্তা বা পরলোকের ভাবনাকে তিনি প্রশ্রয় দেন নাই। এই যে মনোভাব ইহা নিশ্চয় বিশুদ্ধ দর্শন বা বিজ্ঞানের মনোভাব নহে; আবার যে সুসঙ্গত ভাব-চিন্তার দ্বারা তিনি এই মনোভাবকে শোধন করিয়া লইয়াছিলেন তাহাও কবিজনোচিত রসাবেশের লক্ষণ নয়। ইহার কি নাম দিব?—কবি, দার্শনিক, বিজ্ঞানবিদ্, ঐতিহাসিক, তিনি খাঁটি কোনটাই নহেন; বরং ইহাই বলিতে হয় যে, এখানে এমন একটি দৃষ্টির সৃষ্টি হইয়াছে যাহাতে মানব-মানসের বিভিন্ন বৃত্তি একযোগে কাজ করিতেছে—বাস্তব ও আদর্শের সমন্বয় সাধন হইয়াছে। জীবনের যে বাস্তবরূপ

মানুষকে চিরদিন উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে, সেই বিরাট দুর্জ্জেয় দুঃসহ বাস্তবের সম্মুখীন হইবার সাহস বা শক্তি যাহাদের নাই, তাহারাই বঙ্কিমচন্দ্রকে অবাস্তব ভাববিলাসী বলিয়া নাসা কুঞ্চিত করে, এবং বাস্তবের নামে অবাস্তবেরই সাহিত্য রচনা করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির বিরুদ্ধে আধুনিক রসিকমণ্ডলীর অভিযোগ এই যে, তাহাতে প্রবল নীতিনিষ্ঠা ও যুক্তিবিরুদ্ধ কল্পনা—এমন কি, অলৌকিক ও অপ্রাকৃতও স্থান পাইয়াছে। এই অভিযোগের কোনটি তথ্য হিসাবে মিথ্যা নয়, এবং তত্ত্ববিচারের দ্বারা তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিলেও কোনও ফললাভ হইবে না। কারণ সাহিত্যের বিরুদ্ধে যে আপত্তি, তাহা প্রধানতঃ তত্ত্বঘটিত নয়, রুচিঘটিত ; রসের কথাটা অনেক সময়েই অবান্তর—রসের ধার খুব কম লোকেই ধারে। রুচি ও রসজ্ঞান এই দুইটি প্রায় এক সঙ্গে অবস্থান করে না—রসজ্ঞানশাসিত রুচি ও রসজ্ঞানবর্জ্জিত রুচি, এ দুইয়ের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। জীবনকে দেখিবার ভঙ্গি সাধারণ রসিকের একরূপ, আর্টতান্ত্রিক সাহিত্যবিলাসীদের এক-রূপ, এবং ভাবুক মনস্বী অথচ রসরসিক পুরুষের আর একরূপ। বঙ্কিমচন্দ্র যে রসিক ছিলেন, এ কথা বোধ হয় আজিকার অধ্যাপকেরাও স্বীকার করিবেন ; এবং ভাবকে ভাষায় রূপ দিবার শক্তি যে তাঁহার ছিল, এ কথা ছাত্রসভায় স্বীকার না করিলেও, মনে মনে বোধ হয় স্বীকার করেন। বাকি দাঁড়াইতেছে এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের একটা অর্থ করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি তথাকথিত আর্ট লইয়াই তৃপ্ত ছিলেন না। ইহাতে যদি কোনও অভিযোগের কারণ থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে তাহা যে রুচিঘটিত তাহাতে সন্দেহ নাই ; কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের সেই জীবন-বাদ তাঁহার কাব্যে রূপপরিগ্রহ করিয়াছে, তিনি যে কত বড় কবি তাহা স্বীকার করিবার মত রসজ্ঞানী রসিকের অভাব পূর্ব্বেও যেমন হয় নাই, পরেও হইবে না ; কোন বড় কবির পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, সাক্ষাৎভাবে আমি তাহার প্রতিবাদ করিলাম না। কারণ, সে প্রতিবাদ নিষ্ফল। রসবোধ যুক্তির চেয়ে বড়, সেখানে যুক্তি প্রয়োজনই হয় না ; কিন্তু রুচি যদি মানুষের প্রবৃত্তির মত—রিপুর মত—অন্ধ ও প্রবল হইয়া উঠে, এবং সেই সঙ্গে মহামূর্খতাকেই পরম পাণ্ডিত্য বলিয়া গর্ব্ব করিবার মত একটি সমাজের সৃষ্টি হয়, তবে তাহার বিরুদ্ধে কোন যুক্তি কোন তর্ক চলে না ; আরও কারণ এই যে, আজিকার দিনে এইরূপ পাণ্ডিত্যই অতিশয় সুলভ হইয়াছে। আমি পূর্ব্বে শুধুই রসিকতা নয়, রসজ্ঞানেরও উল্লেখ করিয়াছি, এখানে সে সম্বন্ধে আরও কিছু বলিব। নিছক কাব্য-রসের আস্বাদনে আমাদের যে বৃত্তি চরিতার্থ হয়, তাহার সঙ্গে জীবন বা জগৎসমস্যার কোনও সম্পর্ক নাই। আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম—যিনি জীবন-সত্যকে উৎকৃষ্ট কবি-কল্পনার সহিত যুক্ত করিয়াছিলেন ; জীবনের সহিত সেই বোঝা-পড়ার ভার তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র

বা মোক্ষশাস্ত্রের উপরে বরাত দিয়া তাহাকে কাব্যসাহিত্য হইতে দূরে রাখেন নাই। কিন্তু কবিমানসের এই যে জীবন-জিজ্ঞাসা, ইহাও রূপরসপ্রধান—ইহারও মূলে আছে অপরোক্ষ অনুভূতি, অতএব ইহা উৎকৃষ্ট কবিকল্পনার পরিপন্থী নহে। ইহাকে রসিকতা না বলিয়া রসজ্ঞান বলিয়াছি এই জন্য যে, এইরূপ প্রেরণায় ব্রহ্মাস্বাদের পিপাসা নাই, ব্রহ্মের পরিবর্ত্তে এই জগৎ-সৃষ্টিই সর্ব্বদা সমক্ষে বিদ্যমান থাকে এবং তাহারই রহস্যভেদজনিত আস্বাদ কবিচিত্তে আনন্দ দান করে—শুধুই আনন্দ নয়, সেই আনন্দের হেতু সম্বন্ধেও সজ্ঞানতা থাকে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা জগৎ ও জীবনকে অতিক্রম করিতে চাহে নাই, তিনি জীবনের বাহিরে আর কিছুকে স্বীকার করেন নাই, তাঁহার আধ্যাত্মিকতাও সম্পূর্ণ আধিভৌতিক, এজন্য খাঁটি হিন্দুর দিক দিয়া তিনি নাস্তিক ছিলেন। আবার এই জীবনের বাস্তব-গভীর সমস্যাকে, রসবাদী আর্টিস্টের মত—পাশ্চাত্য সংশয়বাদীর মত—অগ্রাহ্য করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার মত প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না; তাই আর এক অর্থে তিনি ঘোরতর আস্তিক; এই আস্তিকতার জন্যই তিনি সাহিত্যে নীতিপরায়ণতার অপরাধে অপরাধী। জীবনের প্রতি যাহাদের সত্যকার শ্রদ্ধা নাই, আপন আত্মারও প্রতি যাহাদের আস্থা নাই, তাহারাই বাস্তববাদের নামে বঙ্কিমের বিরুদ্ধে কলরব করিয়া থাকে।

রসের বিচারে কোনরূপ ফিলজফি বা মতবাদের পৃথক মূল্য নাই তাহা জানি, কিন্তু ইহাও সত্য যে, উৎকৃষ্ট কবিপ্রেরণার যে বাণী, তাহাতে জীবন বা ভাগবত সৃষ্টির সম্বন্ধে একটা বিশেষ উপলব্ধি ফুটিয়া উঠে—এই উপলব্ধির নানা রূপ আছে। শেক্স্পীয়ারের নৈর্ব্যক্তিক কল্পনায় মানুষের ভাগ্য ও জগৎবিধানের কোনও সুস্পষ্ট অর্থ ধরা না পড়িলেও, মহাকবির একটা মনোভাব তাহার মূলে নিশ্চয়ই বিদ্যমান আছে। সেই মনোভাবের প্রকাশ-ভঙ্গি হইয়াছে নাটক। বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্তে যে জগৎ-সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল, তাহার ফলে, একরূপ মনোভাব এক নূতন সাহিত্যিক রূপ আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে—অলঙ্কার-শাস্ত্রের শ্রেণীবিভাগ অনুসারে আমরা সেই রূপকে উপন্যাস নামে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি। তাঁহার অপরাপর রচনায় যে সজ্ঞান চিন্তা ও বিচারবুদ্ধি আছে, তাহাও সেই এক ভাবদৃষ্টির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—সে যেন সেই একই ভাবানুভূতির টীকাভাষ্য। বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনা এই দুইয়ের এমন আশ্চর্য্য একমুখীনতা সচরাচর দেখা যায় না। পূর্ণ মনুষ্যত্বের যে আদর্শ তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল, তিনি আপনার মধ্যেই যেন তাহার কতকটাকে পাইয়াছিলেন। ইহা যে তাঁহার নিজ ব্যক্তিত্বেরই একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশ—কোনও তত্ত্ব বা চিন্তাগ্রন্থি নহে, তাঁহার উপন্যাসগুলিই তাহার প্রমাণ। কারণ, চিন্তামাত্রেই বিশ্লেষাত্মক, তাহা দ্বারা রূপসৃষ্টি হয় না; সকল তত্ত্বই নিরাকার—তত্ত্বও ভাবরূপেই অপরোক্ষ হয়; এবং যখন সেই ভাব রূপধারণ করিবার সামর্থ্য লাভ করে, তখনই তাহা সেই শক্তির বলে সৃষ্টির সত্যে পরিণত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে ইহার সাক্ষ্য রহিয়াছে ; গ্রন্থের মুখবন্ধে, বা আখ্যাপত্রের উপরে নানা বচন উদ্ধৃত করিয়া, তিনি যে তত্ত্বটির প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন, তাহাই আখ্যানমুখে, ভাবকল্পনার অবারিত বেগে, জীবনের পটভূমিকার উপরে রঙে ও রেখায় প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। 'দেবীচৌধুরাণী'র প্রফুল্ল এমনই একটি শরীরী চিন্তা, তথাপি কে বলিবে সে একটি রূপক মাত্র—জীবন্ত নারীমূর্ত্তি নহে! 'আনন্দমঠ' এমনই একটা ভাবচিন্তার বাণী-রূপ—শুধু তাহাই নহে, একটা সম্পূর্ণ বিদেশী ভাব-সত্যকে, তিনি এই দেশের জল মাটি আকাশ ও অরণ্যের পরিবেশে, এবং এই জাতির মজ্জাগত সংস্কারের অনুকূল করিয়া, কি জীবন্ত জগৎরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন! আমি এখানে তাঁহার কল্পনা বা সৃষ্টিশক্তির কথাই বলিতেছি না—সে কবিত্বের যে নিদর্শন তাঁহার কাব্যে আছে, তাহা সকল শ্রেষ্ঠ কবির পক্ষেই গৌরবজনক ; এখানে আমি কেবল ইহাই বলিতেছি যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র সাহিত্যকীর্ত্তির মূলে ছিল যে প্রেরণা তাহা কোনও চিন্তা বা মতবাদের প্রেরণা নহে ; তাহা সেই পূর্ণ দৃষ্টি ; যাহার বলে, ভাব ও রূপ, তথ্য ও তত্ত্ব, বাস্তব ও আদর্শ এক হইয়া যায়, রসপিপাসা ও জীবন-জিজ্ঞাসার মধ্যে কোনও বিরোধ আর থাকে না।

এই যে প্রতিভা—ইহা এমনই স্বতন্ত্র যে, ইহার বাণী সাহিত্যবিচারে একটা নূতন আদর্শ ও নূতন রুচির দাবি করিতেছে। বঙ্কিম-সাহিত্যে একটা জীবনবাদেরই প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সে জীবনবাদের এক দিকে আছে প্রত্যক্ষের উপাসনা, যাহা আছে তাহা ছাড়া আর কিছুকে স্বীকার না করিয়া, তাহারই ইঙ্গিত-অনুযায়ী পূর্ণ-মনুষ্যত্বের সন্ধান। অপর দিকে আছে, সেই প্রত্যক্ষকে একটি সমগ্র উপলব্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত করা—জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম, এই ত্রিবিধ উৎকণ্ঠার নিবৃত্তি সাধন। প্রথম দিকটির প্রেরণা য়ুরোপীয় ; দ্বিতীয়টি ভারতীয় সংস্কারের ফল। তিনি জীবনকে কেবলমাত্র আর্টের অধীন করিয়া দেখেন নাই, মানুষের চরিত্রে অন্ধ নিয়তির লীলাই প্রত্যক্ষ করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যে রোমান্স-রস আছে তাহার কারণ রসাবেশের অসংযম নহে ; অতিশয় স্থিরদৃষ্টিতে জীবনের বাস্তব-মহিমাকে বরণ করিয়া যথাযথ প্রকাশ করিবার আকাঙ্ক্ষাই তাহার কারণ। এজন্য তাঁহার রচনায় যে নীতিজ্ঞানের প্রভাব আছে, তাহাতে যদিও আর্ট ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহাতে সাহিত্যের ক্ষতি হয় নাই। কারণ, সাহিত্যের উৎস আর্ট নহে—ব্যক্তি-প্রতিভা ; এবং জীবনকেই যে যত বড় করিয়া দেখিয়াছে সেই তত বড় ব্যক্তি—তাহার যে বাণী তাহাই উৎকৃষ্ট স্টাইল, তাহাই great art ; আর সকল আর্ট—আর্ট মাত্র ; সে আর্ট মৌসুমী ফুলের মত, যেমন চমকপ্রদ তেমনই ক্ষণস্থায়ী। যে সকল কাব্য আদিকাল হইতে মানুষের জীবন-রসে অভিষিক্ত হইয়া আজও পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছে, যাহার আর্ট মানুষের প্রাণের আকুল উৎকণ্ঠা নিবারণ করে, যাহার মধ্যে তাহার ভয়-ভাবনা দ্বন্দ্ব-সংশয় একটি পরম

উপলব্ধির দ্বারা আশ্বস্ত হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা সেই শ্রেণীর, তাঁহার সাহিত্য-কীর্ত্তিও সেই প্রশস্ত ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। তথাপি তাঁহার তুলনা তিনিই। বর্ত্তমান যুগে সেই সাহিত্যের যে পরিণাম লক্ষ্য করা যায়, তাঁহার গদ্যকাব্যগুলি তাহারই শেষ নিদর্শন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্ব্বে য়ুরোপীয় জ্ঞান-সাধনা, একজন বাঙালীর প্রতিভাকে আশ্রয় করিয়া যে ভারতীয় মনীষাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল, তাহার ফলে জীবনের বাস্তব যে ধরণের কল্পনায় এক নূতন রূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার যথার্থ মূল্য নিরূপণে এখনও বিলম্ব আছে।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীমতী সফিয়া খাতুন

মরহুম বঙ্কিমচন্দ্রের শতবার্ষিক উৎসবে আমি তাঁকে আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধা অর্পণ করি, প্রণাম করি।

বাংলার সাহিত্যসম্রাট্, "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের স্রষ্টা, আমাদের জাতীয় জীবনের প্রথম ঋত্বিক বঙ্কিমচন্দ্রকে যাঁরা সাম্প্রদায়িক বলে অপমান করেন, তাঁদের বুদ্ধির বিকৃতি দেখে মনে ক্ষোভ জাগলেও তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। পৃথিবীতে একদল মানুষ থাকবেই যারা মূঢ়তা দ্বারা মানুষের মাহাত্ম্যকে অবিশ্বাস করে, মানুষের সত্যকে তারা দেখতে পায় না। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাকে যাঁরা অস্বীকার করেন, তাঁদের মনোবৃত্তি এত ক্ষুদ্র যে তাতে লজ্জিত হতে হয়। 'আনন্দমঠ', 'রাজসিংহ', 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রভৃতি পুস্তকে যাঁরা সাম্প্রদায়িকতার জীবাণু খুঁজে বেড়ান, তাঁদের মস্তিষ্ক সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। ইতিহাসের সত্যকে যাঁরা প্রকাশ করেন, কাব্যে বা উপন্যাসে তাঁরা সেই সমসাময়িক মানুষের মনোভাবকে প্রকাশ করতে বাধ্য। তা না হ'লে সাহিত্যের অঙ্গহানি ঘটে। সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের বা রাজপুত-পাঠান যুগের পরস্পরের বিরোধী ভাবগুলিকে কাব্যে বা উপন্যাসে প্রকাশ করলেই লেখককে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া চলে না।

বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্রকে। এবং সেই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হতে পারে ব'লে তিনি স্পষ্টভাষায় বলেছেন, "হিন্দু হ'লেই ভাল হয় না বা মুসলমান হ'লেই মন্দ হয় না। আবার মুসলমান হ'লে ভাল হয় না, হিন্দু হ'লে মন্দ হয় না। ভাল মন্দ লোক দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই আছে।"

সাম্প্রদায়িক মানুষগুলি কিন্তু এতে সন্তুষ্ট হ'তে পারেন নি, তাঁরা এর উপরেও সুর চড়িয়ে করলেন জাতীয় সঙ্গীত "বন্দে মাতরম্"-এর উপর যুদ্ধঘোষণা। এই সঙ্গীতের মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি কল্পনা করা হয় নি, দেশমাতৃকার স্তব করা হয়েছে।

"মহেন্দ্র গীত শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল, কিছু বুঝিতে পারিল না—সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা মাতা কে—জিজ্ঞাসা করিল, 'মাতা কে?' উত্তর না করিয়া ভবানন্দ গায়িতে লাগিলেন—'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্। ইত্যাদি।'

মহেন্দ্র বলিল, 'এ ত দেশ, এ ত মা নয়।'
ভবানন্দ বলিলেন, 'আমরা অন্য মা মানি না।'
'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।'

—'আনন্দমঠ'

বঙ্কিমের সাহিত্য-প্রতিভাকে ছোট ক'রে দেখলে নিজেদেরই ছোট ক'রে দেখা হবে। রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য যাঁরা সাম্প্রদায়িক কদর্য্যতাকে সাহিত্য বা ধর্ম্মের মধ্যে টেনে আনেন, তাঁদের অসাধু উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করবার জন্যে প্রত্যেক সত্যাশ্রয়ী মুসলমানের উচিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেখান। তা যদি আমরা না করি, তা হ'লে জাতীয়তার সঙ্গে সাহিত্যেরও গতি রুদ্ধ হবে। বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমানকে ছোট ক'রে দেখেন নি, তাঁর উপন্যাসে এমন কতকগুলি মুসলমান চরিত্র আছে, যা নাকি হিন্দু চরিত্র অপেক্ষাও মহৎ। ঐতিহাসিক উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তব মানুষেরই ছবি এঁকেছেন, কাল্পনিক বড় একটা কিছু নাই।

বঙ্কিমের সাহিত্য-সাধনার শতবর্ষ পূর্ণ হ'ল। তিনি বাঙালীকে যা দান ক'রে গেছেন, তা অপূর্ব্ব ও শাশ্বত সুন্দর। আজ বঙ্কিমের শতবার্ষিক স্মৃতি-উৎসবে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান সমবেত হয়ে আমরা সকলে তাঁর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

বন্দে মাতরম্

সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি-তর্পণ

১

দেব !
শারদ প্রভাতে দেখি, সোনার তপন জাগে,
রক্ত নভঃস্থলে,
সোনামুখী বসুন্ধরা, সোনালী ছটায় ভরা,
আনন্দে উথলে।
গত শত বর্ষে সেই কাঞ্চন তপন রূপে,
তুমি এসেছিলে ;
শুষ্ক মরু দীন দেশে, স্বর্ণস্রোতাঃ সুরধুনী
তুমি বহাইলে !

২

চুয়াল্লিশ বর্ষ এই, মার কোল ত্যজি সেই,
সেই মধুমাসে—
সে দিনে আকুলা ধরা, দারুণ বিষাদ ভরা,
মলয় বাতাসে।
আকাশে মলিন রবি, প্রকৃতির দীনা ছবি,
ফুল পড়ে ঝরি,
পাপিয়া গাহে নি গান, কলকণ্ঠ-"কুহু" ছিল
"উহু উহু" ভরি !
দেশের গৌরব রবি, হৈম-অস্তাচল-শিরে
করিলে শয়ন
সে দিনের সে বেদনা, মাতৃভূমি মার বুকে
জাগে চিরন্তন !

৩

পুঞ্জীভূত মঞ্জুতারা, তামসী নিশায় যবে
বিরাজে গগনে,
এক শশধর বিনা, সকলি আঁধার তবু
এ ভব-ভবনে!
শূন্য তব কর্ম্মভূমি, শূন্য তব রাজাসন,
সাহিত্যসম্রাট্!
ভারতে ভারতী আর, পরে নি মুকুটমণি
উজলি ললাট!
শুষ্ক সেই পুষ্পবন, বাসন্তী লক্ষ্মীর চির-
প্রিয় নিকেতন,
মূক সেই বীণা বাঁশি, মল্লার দীপক রাগ
নীরব এখন!

*　　*　　*

৪

ধর্ম্মতত্ত্ব মনস্তত্ত্বে, তুচ্ছ সুখ লোভাকুল
কত জনগণে,
ফিরাইলে শুভ পথে, যেমতি ফিরালে সেই
"শৈবলিনী" মনে।
শুধু নহে দস্যুভীতি নীলকর অত্যাচার
করেছ শাসন,
শাসিয়াছ মানবের উন্মত্ত ইন্দ্রিয়-মোহ
"প্রতাপ" যেমন!
অসংযম "বিষবৃক্ষে" মানব জীবন মাঝে,
ফলে কি গরল,
দেখালে "নগেন্দ্রনাথে" বিমুগ্ধ "গোবিন্দলালে"
মহা অমঙ্গল!

ভীষণ কাপালি করে, "কপালকুণ্ডলা" বালা
বনদেবী সমা,
অকাল কুসুম-কলি, অকালে ঝরিয়া গেল
বিশ্ব-মনোরমা !
ললিতা "লবঙ্গলতা" চাপিয়া মনের ব্যথা
পতি-পদ-পূজে,
তাপস "অমরনাথ" "রজনী"রে দয়া দিয়া,
চির শান্তি খুঁজে ।
সে রাজকেশরী-বামে, দৃপ্ত রাজকেশরিণী,
ভাস্বর ভারতে ;
"শান্তি"র অজেয় বর্ম্ম, "প্রফুল্লে" নিষ্কাম কর্ম্ম,
বিচিত্র মরতে ।
দিশাহারা "সীতারাম" উদাসীন পদে ভাঙে
মঙ্গল-কলস,
দেখাইলে চিত্তশুদ্ধি, আত্মত্যাগ, পূত বুদ্ধি
"জয়ন্তী"র যশ ।
নর কিম্বা নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ যাহাই হন—
—মানব দুঃখের—
তথাপি মহিমময় যে আদর্শ অভ্যুদয়
নমস্য বিশ্বের !
গুরুর আসনে বসি 'ধর্ম্মতত্ত্ব' শিক্ষা দিলে
বিধির আদেশে ?—
ভক্তি, প্রীতি, দয়া, কর্ম্ম, শুদ্ধাচার, মনুষ্যত্ব,
নিদ্রালস দেশে ?

৫

আমরা বুঝিব কবে, কত রত্ন কত মণি
করিয়াছ দান,

ক্ষুদ্র আমাদের হিয়া, তার মাঝে আছে আর
কতটুকু স্থান ?
হে গুরো "কমলাকান্ত" ! হে মনীষি ঋষিবর !
অকালে হঠাৎ
অনুরক্ত ভক্তগণে কেন গেলে পরিহরি
একি বজ্রাঘাত !
আর কি গো জাগাবে না, অপরূপ মাতৃস্তবে
সুষুপ্ত সন্তানে,
কি যে ধর্ম্ম, কি যে কর্ম্ম, কে ক'বে সে মর্ম্মকথা,
সে মধুর তানে ?

৬

আবার আসিতে হবে, মৃত সঞ্জীবনী রবে
অমৃত ঢালিতে,
স্বরগ মন্দারমালা, ভরিয়া পূজার ডালা
মাতৃপদে দিতে।
মোরা, মানস-আনন্দমঠে, হৃদয়-মঙ্গল-ঘটে
করি—তোমা আবাহন,
জ্যোৎস্নাপুলকিত যামে, প্রফুল্লকুসুম-দামে
পূজি শ্রীচরণ।
আবার আসিবে তুমি, ডাকে তব মাতৃভূমি
মাগিয়া কল্যাণ,
আসিবে আসিবে ফিরে, কাব্য কলা সাহিত্যেরে
দিবে নব প্রাণ।
এ বাহুতে দিবে শক্তি, এ হৃদয়ে দিবে ভক্তি
হে দেব ! স্বয়ম্,
সপ্ত কোটি কণ্ঠে নিতি, গাব মোরা মহাগীতি
বন্দে মাতরম্।

শ্রীমানকুমারী বসু

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের শত-বার্ষিক উৎসবের সম্ভাবনায় যে দেশব্যাপী উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছে, তাহাতে বঙ্কিমের লোকোত্তর প্রতিভার পুনরালোচনার একটা সুন্দর অবসর ঘটিয়াছে। অতিশয় দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, বঙ্কিমের ন্যায় প্রতিভাশালী লেখকের আলোচনা যথোপযুক্ত হয় নাই। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে মাত্র দুই জন সুধী এ বিষয়ে কতকটা মনোযোগী হইয়াছিলেন—গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী ও স্বর্গীয় অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্কিমের প্রতি এই আপেক্ষিক ঔদাসীন্য আমাদের শিক্ষিত সমাজের একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ। ইউরোপের কোন দেশে তাঁহার ন্যায় লেখকের জন্ম হইলে, তাঁহার সশ্রদ্ধ আলোচনায়, যুক্তি-সহ বিচারবিশ্লেষণে সে দেশের আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিত। আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্র যে স্তুতি-প্রশংসা না পাইয়াছেন তাহা নহে; কিন্তু সে প্রশংসার অধিকাংশ নিবেদিত হইয়াছে তাঁহার স্বদেশ-প্রেমিকতা ও দূর-প্রসারী রাজনৈতিক দৃষ্টির প্রতি। তাঁহার "বন্দে মাতরম্" মন্ত্র লক্ষ লক্ষ নরনারীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে; তাঁহার 'আনন্দমঠ' শত শত দেশবাসীর প্রাণে দেশপ্রীতির প্রথম বীজ:বপন করিয়াছে সত্য; কিন্তু যে নিয়মে আমরা বেদ-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মন্ত্র-প্রণেতা ঋষিকে বিস্মৃত হইয়াছি, সেই নিয়ম বঙ্কিম সম্বন্ধেও অনেকটা প্রযোজ্য হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে যে মতবাদ আমরা উচ্চারণ করিয়াছি, তাহা ভক্তিবিহ্বলতায় অস্পষ্ট, উচ্ছ্বাসের আতিশয্য-বিড়ম্বিত। পক্ষপাতহীন সমালোচনার দ্বারা তাঁহার সাহিত্যিক আদর্শ ও কীর্ত্তির যথাযোগ্য মূল্য-নির্দ্ধারণ, ঔপন্যাসিক সমাজে তাঁহার চিরন্তন স্থান নির্দ্দেশ—এদিকে বিশেষ কোন সম্মিলিত চেষ্টার কৃতিত্ব আমরা দাবী করিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের বঙ্কিমচন্দ্রের উপর একটি সাধারণ সমালোচনা ও 'রাজসিংহ' উপন্যাসের আশ্চর্য্য অন্তর্দ্দৃষ্টির রসগ্রাহিতা অবশ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম। কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিলে সমালোচনা-ক্ষেত্রে একটা নূতন ধারা প্রবর্ত্তন করিতে পারিতেন, আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যের শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে পারিতেন, তাঁহার নিকট এই মুষ্টিভিক্ষায় আমাদের মন তৃপ্ত হয় না—ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

দেশপ্রেমিক বঙ্কিমের শিষ্যত্ব স্বীকার ও সাহিত্যিক বঙ্কিমের প্রতি বিমুখতা—এই অদ্ভুত সমন্বয়শীল মনোবৃত্তির একটা বিশেষ কারণ খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন নহে। বঙ্কিম-পরবর্ত্তী যুগে আমাদের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার নদীতে যেমন জোয়ার আসিয়াছে, আমাদের সাহিত্যিক রোমান্স-প্রবণতার প্রবাহে সেইরূপ ভাটারই প্রাদুর্ভাব। রাজনৈতিক প্রগতিশীলতা সম্বন্ধে বেশি কিছু বলার আবশ্যক করে না—ইহা অতিশয় স্পষ্ট ও স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আমাদের যে সনাতন রোমান্স-প্রবণতা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহাই পরবর্ত্তী যুগে সঙ্কুচিত হইয়া এখন অতি শীর্ণ ধারায় প্রবাহিত হইতেছে। বঙ্কিমের অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগ এক বিপ্লবকারী রুচি-পরিবর্ত্তনের যুগ। ইউরোপীয় সমাজ ও সাহিত্যের সহিত নিবিড়তর সংযোগের ফলে আমাদের সাহিত্যে এক সম্পূর্ণ নূতন আদর্শ অনুসৃত হইতে লাগিল। পাশ্চাত্য সমাজে কতকগুলি অপ্রতিবিধেয় ও স্বাভাবিক বিবর্ত্তনের ফলে উদ্ভূত সমস্যা গুরুত্ব লাভ করিয়াছে ও ইহাদের আলোচনা সাহিত্যেরও প্রধান বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মুখ্য হইতেছে—যৌন ও দারিদ্র্য-সমস্যা। পাশ্চাত্য দেশে সমাজনীতির আদর্শ-বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলতার জন্য এবং ধনী ও শ্রমিকের মধ্যে ক্রম-বর্দ্ধমান অবস্থা-বৈষম্যের জন্য এই সমস্যাগুলি জীবনে দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছে, এবং জীবনের মর্ম্মস্থল হইতে সাহিত্যের কেন্দ্রস্থলে স্বতঃই স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই সমস্ত সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবতা-প্রধান ও রোমান্স-বিমুখ সাহিত্যিক মনোবৃত্তিও গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের সমাজে এই সমস্ত প্রশ্ন কেবল অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। কিন্তু আমাদের সাহিত্য পাশ্চাত্যের অনুকরণে জীবনের স্বাভাবিক বিকাশকে বহুদূরে ছাড়াইয়া গিয়া এই সমস্ত অর্দ্ধকৃত্রিম সমস্যাবিচারে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, এবং ইহার অনুকূল সাহিত্যিক ভঙ্গী ও মনোবৃত্তি অর্জ্জনে সচেষ্ট হইয়াছে। ইহাই বঙ্কিমের সঙ্গে অতি-আধুনিক যুগের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিচ্ছেদ। এই-জাতীয় সমস্যা আলোচনার জন্য যেরূপ আণুবীক্ষণিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতির প্রয়োজন, তাহার অভাবই অতি-আধুনিকের চক্ষে বঙ্কিমের সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক ত্রুটি। ইহাই সাধারণত বঙ্কিমের অবাস্তবতা, গভীর মনস্তত্ত্ব-জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়।

তারপর অক্ষমতাও বঙ্কিমের পদাঙ্ক অনুসরণের প্রতিবন্ধকতা করিয়াছে। বঙ্কিম ঐতিহাসিক প্রতিবেশ হইতে যে রোমান্স আহরণ করিয়া আমাদের প্রাত্যহিক পারিবারিক জীবনে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্ত্তীরা সেই রোমান্সের মূলসূত্র ধরিতে পারেন নাই। ইতিহাসলব্ধ রোমান্স উপন্যাস-ক্ষেত্রে বঙ্কিম এবং রমেশচন্দ্র ও নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রায় নিঃশেষিত করিয়া দিয়াছেন। ইতিহাসের যখন যোদ্ধবেশ, যখন ইহা বীরত্ব-প্রভায় ভাস্বর, তখন ইহার গতিবেগ ও দীপ্তি সাধারণ জীবনে সংক্রামিত হইয়া ইহাকে মহিমান্বিত

করিয়া তোলে। ইতিহাসের এই রণোন্মাদ জীবনের তালকে দ্রুততর করে, ইহার বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত শক্তিকে একটা বিরাট উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য সংহত করিয়া এক স্মরণীয় বিকাশের দিকে লইয়া যায়। বর্ত্তমান যুগের ঔপন্যাসিকেরা ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে এই বীরত্বের অভিনয়, এক বিশাল ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অবসর, দেখিতে পান না ;—আধুনিক ইতিহাস কূটনীতি ও তার্কিকতার লীলাক্ষেত্র। ঐতিহাসিক কল্পনার একান্ত অভাবের জন্য, অতীত ইতিহাসে পুনর্জীবন-সঞ্চার করিতে বঙ্কিম যেটুকু সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, আধুনিক ঔপন্যাসিকেরা তাহার কাছাকাছিও যাইতে পারেন না। সুতরাং ইতিহাসের সিংহদ্বার তাঁহাদের নিকট চিরকালের জন্য রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম বয়সের উপন্যাসে ইতিহাস-ক্ষেত্রে পদার্পণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইতিহাসের বিরাট প্রাঙ্গণতলে তিনি নিজের আধ্যাত্মিকতা ও আদর্শবাদের দুই একটি ছায়ামূর্ত্তি ছাড়া আর কিছু দেখেন নাই। পরবর্ত্তী যুগে বঙ্কিম-প্রভাবের খর্ব্বতার ইহাও একটি অন্যতম কারণ।

সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কারণ অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের বিপরীতমুখী প্রভাব। বঙ্কিমের তিরোভাব হইতে না হইতেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অপরূপ আবির্ভাব আমাদের সমস্ত বিচার-শক্তি ও রসবোধকে এক সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে। এই উদীয়মান সূর্য্যের প্রখর কিরণে আমাদের চক্ষু ধাঁধিয়া গিয়াছে—সাহিত্যের আদর্শ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত চিন্তাধারা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই নব জ্যোতিষ্কের আড়ালে পড়িয়া বঙ্কিমের স্মৃতি যে অপেক্ষাকৃত ম্লান ও ধূসর হইয়া পড়িয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের রোমান্স বঙ্কিম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ জাতীয়—ইহার উদ্ভব ইতিহাসের বহিঃপ্রাঙ্গণে নহে, লেখকের নিজ মানসকল্পলোকের মধ্যে। তাঁহার সর্ব্বগ্রাসী কাব্য-শক্তি উপন্যাসকে কবিতার অধীন করদরাজ্যে রূপান্তরিত করিয়াছে। আবার তাঁহার 'ঘরে-বাইরে,' 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি উপন্যাসে আধুনিক সমস্যা চিরন্তন সমাজগণ্ডী হইতে বাহির হইয়া পড়িয়া একটা অসাধারণ তীব্রতা লাভ করিয়াছে। বঙ্কিমের সমাজ-বেষ্টনীর মধ্যে সংরক্ষিত, বাহিরের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত সমস্যা রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনায় এত তীক্ষ্ণ ও প্রশ্নসঙ্কুল হইয়া উঠে নাই। শরৎচন্দ্রও মোটামুটি রবীন্দ্রনাথের ধারারই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার রোমান্স আসিয়াছে সমাজ-শৃঙ্খলহীন ভবঘুরে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও পল্লীবালকসুলভ নির্ভীক দুঃসাহসিকতার কাহিনী হইতে। তিনি প্রেমের উদ্ভব-রহস্য, ইহার বিধি-নিষেধ উল্লঙ্ঘন-প্রবণতা ও সূক্ষ্ম ঘাত-প্রতিঘাতের যেরূপ গভীর ও বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, বঙ্কিমের বিশ্লেষণে সেরূপ বাস্তবতা ও অন্তর্দৃষ্টি নাই। বঙ্কিমের প্রেমের ধারণা প্রাচীন সাহিত্য ও সমাজ-রীতি হইতে সংগৃহীত ; তাঁহার ভ্রমর, সূর্য্যমুখী, কুন্দনন্দিনীর মধ্যে প্রেমের যে ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা মোটের উপর

চির-প্রথাগত পৌরাণিক তটভূমির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দাম্পত্য-প্রেমের মধ্যে তিনি সনাতন মিলন-বিরহ, অভিমান-মনোমালিন্য, ও পুনর্মিলনেরই শোভাযাত্রা দেখিয়াছেন। তাঁহার প্রেম-কাহিনীতে দুইটি মাত্র প্রবল বিপরীত ধারার প্রবাহ লক্ষিত হয়; কিন্তু প্রত্যেকটি ধারার মধ্যে আবার যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বীচিবিক্ষেপ, সংশয়-আন্দোলনের মৃদু কম্পন অনুভূত হয়, তাঁহার অণুবীক্ষণযন্ত্রে সেগুলি ধরা পড়ে নাই। অবৈধ প্রেম তিনি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ইহাকে তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন কবিত্বময় সাঙ্কেতিকতার মধ্য দিয়া, আণুবীক্ষণিক দিন-লিপির মধ্য দিয়া নহে। তাঁহার রোহিণী কি করিয়া গোবিন্দলালের সহিত প্রেমে পড়িয়াছে, তাহার মূলসূত্রটি তিনি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের সাহায্যে প্রকটিত করিয়াছেন; তাহার অতৃপ্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষা মুহূর্ত্তের জন্য বিদ্যুৎ-ঝলকের ন্যায় আমাদের নিকট উদ্ভাসিত হইয়াছে। গোবিন্দলালের সমবেদনায় এই ক্ষীণ প্রেমশিখা উজ্জ্বল হইয়াছে; বারুণীর জলে ডুবিয়া মরার চেষ্টাতে ইহার অপ্রশমিত বেদনার অতর্কিত বিকাশ আমাদিগকে বিস্ময়-ব্যথিত করিয়াছে। গোবিন্দলালের দিক দিয়াও একটা অনুরূপ আকর্ষণ একটি মাত্র পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত দেখাইয়াই তিনি বিশ্লেষণ-কার্য্য স্থগিত রাখিয়াছেন। হৃদয়ের বিক্ষোভ ও আকর্ষণ কি করিয়া দৈহিক সম্বন্ধের নাগপাশে জড়িত হইয়া পড়িল, তাহার গ্রন্থিবন্ধনগুলি নিখুঁতভাবে দেখানো তিনি প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই। প্রলোভন ও পতন—ইহার মধ্যবর্ত্তী স্তরগুলি পাঠক অনায়াসেই কল্পনা করিয়া লইতে পারিবে, এই বিশ্বাসে তিনি তাঁহার বিশ্লেষণে ইচ্ছাপূর্ব্বকই অনেকটা ফাঁক রাখিয়াছেন। তাঁহার সুরুচি ও সংযম-জ্ঞান এইখানে তাঁহার কলমের মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে। আধুনিক ঔপন্যাসিক ও পাঠক কিন্তু এই সঙ্কোচের সমর্থন করেন না। তাঁহারা মনে করেন যে, বঙ্কিম যে স্তরগুলি উপেক্ষা করিয়াছেন, ঠিক তাহাদের মধ্যেই কোন বিশেষ প্রণয়-কাহিনীর অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। প্রায় সমস্ত প্রেমেরই আদি ও অন্ত—আকর্ষণ ও পদস্খলন একরূপ; যাহা কিছু বৈচিত্র্য তাহা ঐ মধ্যবর্ত্তী স্তরগুলির মধ্যেই বিদ্যমান। আবার বঙ্কিমের উপন্যাসে পদস্খলনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—মোহভঙ্গ ও অনুতাপ। কিন্তু আধুনিক উপন্যাস এই সনাতন নীতির অনুমোদিত পরিসমাপ্তির বৈধতা স্বীকার করে না। বর্ত্তমান যুগের ঔপন্যাসিক সমাজবিধি উল্লঙ্ঘনের মধ্যে হয় প্রশংসার্হ বিদ্রোহ ও মুক্তির আনন্দ আবিষ্কার করেন, না হয় মনুষ্যত্বের আরও গভীরতর অবনতি, নিদারুণতর লাঞ্ছনা, চরম অধোগতির সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করেন। আর্টের পদ্ধতি ও আদর্শ সম্বন্ধে বঙ্কিমের সহিত তরুণ পাঠকের এই মতভেদ আজ তাঁহার প্রতিভা সম্বন্ধে সংশয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু কুহেলিকা কাটিয়া গেলে সূর্য্যালোক যেমন দীপ্ততর হইয়া উঠে, সাময়িক ভ্রান্তি-নিরসনের পর বঙ্কিমের প্রতিভাও সেইরূপ দেদীপ্যমান হইবে—ইহা আশা করা অসঙ্গত হইবে না।

বঙ্কিমের উপন্যাসসমূহের ব্যাপক সমালোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের পরিধির মধ্যে সম্ভব নহে ; বর্ত্তমান উপলক্ষ্যও সেরূপ চেষ্টার প্রতিকূল। আমি কেবল এখানে কোন্ কোন্ বিশেষ গুণের উপর তাঁহার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত, তাহা সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিব।

তাঁহার সম্বন্ধে প্রথম কথা হইতেছে—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ আধুনিকতা। বাঙ্গালা সাহিত্যে ও সমাজে আধুনিকতার প্রবর্ত্তনের জন্য অনেকেই কৃতিত্ব দাবী করিতে পারেন। সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য—রাজা রামমোহন রায়, তিনিই প্রথম শাস্ত্রালোচনায় ও ধর্ম্মজীবনের বিচারে স্বাধীন চিন্তার প্রবর্ত্তন করেন। সে হিসাবে তিনিই বঙ্গদেশে আধুনিকতার অগ্রদূত। তাঁহার পরে অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দাবীই অগ্রগণ্য। ইঁহারা নানা দিক দিয়া পুরাতন সমাজ-মনে স্বাধীন চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করিয়া, তাহার অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন কোণগুলি প্লাবিত ও পরিষ্কৃত এবং সেখানে অনেক নূতন চিন্তা ও আদর্শের বীজ বপন করিয়াছেন ; যাহা এখন ফলে ফুলে সমৃদ্ধ হইয়া পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু আধুনিকতার সৃষ্টি করিতে শুধু যে লৌকিক চিন্তার প্রয়োজন হয় তাহা নয়, নূতন ভাব-প্রকাশোপযোগী ভাষাও তাহার একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ। রামমোহন, অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর নূতন ভাবের সন্ধান পাইয়াছিলেন ; কিন্তু ভাষার দিক দিয়া তাঁহারা অতীত সংস্কৃতির সঙ্কীর্ণতার সহিত যুক্ত ছিলেন। তিল তিল করিয়া নূতন ভাব সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা আধুনিক মনোবৃত্তির ভিত্তি-রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ভাষা আড়ষ্ট, জড়তাগ্রস্ত ও মন্থরগতি ছিল। আধুনিক মনের লীলা-চঞ্চলতা, ক্ষিপ্রগতি, সব্যসাচিত্ব (versatility), বিদ্যুৎশিখার ন্যায় ভাস্বর পরিবর্ত্তনশীলতা, আবেদনবৈচিত্র্য (variety of appeal) বঙ্কিমচন্দ্রেই সর্ব্বপ্রথম পূর্ণবিকশিত হইয়াছে। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীদের তূণীরে এক প্রকারেরই অস্ত্র ছিল—তাঁহাদের গুরু-গম্ভীর বচনবিন্যাস, অভ্রান্ত শাস্ত্রবিচার ও উঁচু স্বরে বাঁধা নৈতিক আবেদন প্রতিপক্ষের স্থূল গণ্ডার-চর্ম্মে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিত। বঙ্কিমচন্দ্র যুদ্ধ চালাইবার অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিলেন ; তাঁহার আক্রমণ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীদের গদাযুদ্ধে পর্য্যবসিত হয় নাই। তাঁহার তূণীর বিচিত্র আয়ুধে পূর্ণ ছিল—তীক্ষ্ণ বিদ্রূপাস্ত্র, প্রচ্ছন্ন উপহাস, গূঢ়ার্থ রূপক, অচ্ছেদ্য তর্কজাল ও শ্রেণীবিন্যস্ত যুক্তি-পরম্পরা, ইতিহাসের ভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত পূর্ব্বোদাহরণ (precedent), অফুরন্ত স্বতঃউৎসারিত রসিকতা, লঘু-কল্পনার ইন্দ্রজাল (fantasy) ও গভীর মর্ম্মস্পর্শী অশ্রুপূর্ণ আবেগ—এই সমস্ত অস্ত্রেই তাঁহার তুল্যরূপ অধিকার ছিল। পুরাণবর্ণিত বীরের ন্যায় তিনি তাঁহার প্রতিপক্ষের যুক্তিকে ক্রোধের অগ্নিবাণে ভস্মীভূত করিয়াছেন, অজস্র উপহাসের বরুণাস্ত্রে গঙ্গাপ্রবাহে ঐরাবতবৎ ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছেন ও ভাবাবেগের বায়ব্যাস্ত্রে ছিন্নভিন্ন করিয়া

রেণুপরমাণুতে গুঁড়া করিয়া উড়াইয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বিধবাবিবাহ-বিষয়ক গ্রন্থে দেশাচারকে সম্বোধন করিয়া যে দীর্ঘ আক্ষেপোক্তি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কোমল দয়ার্দ্র হৃদয় ও অপরিণত তর্কশক্তি একসঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহনিবারণ-বিষয়ক গ্রন্থের আলোচনা উপলক্ষ্যে বহুবিবাহ রোধকল্পে ধৃতাস্ত্র লেখককে ডন কুইক্সোটের সহিত তুলনা করিয়া অতি সংক্ষেপে তাঁহার প্রচেষ্টাকে হাস্যাস্পদ করিয়াছেন। বঙ্কিমের যোদ্ধবেশ সুদর্শনহস্ত বিষ্ণুর ন্যায় যুগপৎ সম্ভ্রম ও ভীতির উদ্রেক করে। তাঁহার শাণিত অস্ত্রের সম্মুখে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিবর্গ অভিমন্যুর নিকট কুরুসৈন্যের ন্যায় পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়াছে। অবশ্য তাঁহার তর্কের মধ্যে একটু জোর-জবরদস্তির ভাব, প্রতিপক্ষের প্রতি একটা অবহেলা ও অবজ্ঞার সুর সময় সময় লক্ষ্য করা যায়। ইহা নীতির দিক দিয়া হয়তো সর্ব্বথা সমর্থনযোগ্য নহে ; কিন্তু তর্কযুদ্ধে ইহা প্রত্যেক আঘাতের শক্তি বাড়াইয়া প্রতিপক্ষকে একেবারে ভূমিশায়ী করিয়া ফেলে। বঙ্কিম যদি একখানিও উপন্যাস না লিখিতেন, তথাপি তাঁহার 'বিবিধ প্রবন্ধ' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' তাঁহাকে সাহিত্যক্ষেত্রে অমর করিত। আর এই যুদ্ধের উপযোগী ভাষা তাঁহার হাতে শাণিত তরবারির ন্যায় শ্লেষ-বিদ্রূপ-ভাবাবেগের সূর্য্যালোকে ঝকমক করিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ভাষাই তাঁহার সম্পূর্ণ আধুনিকতার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। ইহা রবীন্দ্রনাথের নির্ঝরের ন্যায় 'ভূধর হইতে ভূধরে ছুটিয়া' 'রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া' বাধা-বিঘ্নের উপলখণ্ডকে সবলে অপসারিত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে, গিরিনদীর নৃত্য-চপলতা ও ধূর্জ্জটির জটাজালের ন্যায় মহান্ গাম্ভীর্য্য, উভয় গুণেরই অপরূপ সংমিশ্রণ লক্ষিত হয়।

বঙ্কিমের দ্বিতীয় কৃতিত্ব হইতেছে—তাঁহার উপন্যাসাবলীর পরিকল্পনার মৌলিকতা। আমরা প্রায়ই বঙ্কিমের উপর পাশ্চাত্য প্রভাবের কথা আওড়াইয়া থাকি। কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে স্পষ্টই বোঝা যাইবে যে, এই ঋণের পরিমাণ ও প্রকৃতি অত্যন্ত অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে। বঙ্কিমের উপন্যাসসমূহ ১৮৬৫ সাল হইতে ১৮৮৭ পর্য্যন্ত এই একুশ বৎসরের মধ্যে রচিত হয়। এই সময়ে ইংরেজী সাহিত্যে যে সমস্ত ঔপন্যাসিক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই এক একটি দিকপাল। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে Scott ও Jane Austen, এবং এই যুগে Dickens, Thackeray, George Eliot, Charlotte Bronte, George Meredith ও Thomas Hardy প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকেরা লেখনী চালনা করিতেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমের উপন্যাসের প্রণালী ও ভাবভঙ্গী ইহাদের কাহারও দ্বারা প্রভাবান্বিত না হইয়া নিজ মৌলিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল, ইহা তাঁহার কম কৃতিত্বের পরিচয় নহে। আমরা সাধারণত বঙ্কিমকে স্কটের সহিত তুলনা করি, ও তাঁহার 'দুর্গেশনন্দিনী'তে জগৎসিংহের সহিত আয়েষা-তিলোত্তমার প্রণয় সম্পর্কটির সহিত

Ivanhoe-র Rowena-Rebecca-র সম্বন্ধের সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করিয়া থাকি। এই সাদৃশ্য-আবিষ্কার সম্পূর্ণ অনুমানসিদ্ধ বলিয়াই মনে হয়। বঙ্কিম যে স্কটের নিকট তাঁহার উপন্যাসের মূল ঘটনা সম্বন্ধে ঋণী, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। দুই জন ঔপন্যাসিকের রচনায় নায়ক-নায়িকার সম্পর্কে সাদৃশ্য থাকিলেই যে নিছক ঋণের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হইবে, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। আর এই ঋণ মানিয়া লইলেও বঙ্কিমের মৌলিকতার কোন হানি হয় না। এই দ্বৈত প্রণয়-কাহিনীটি তিনি সম্পূর্ণ নূতন প্রতিবেশে স্থানান্তরিত করিয়াছেন; হতাশ-প্রেমিকা Rebecca-র সহিত আয়েষার, ও Rowena-র অহঙ্কৃত পরুষ ভাবের সহিত তিলোত্তমার বালিকাসুলভ কোমল ব্রীড়াসঙ্কুচিত ভাবের কোনই সাদৃশ্য নাই। সামাজিক অবস্থার দিক দিয়াও Rebecca ও আয়েষা তুলনীয় নহে—Rebecca তদানীন্তন যুগের ঘৃণ্য পতিত ইহুদিতনয়া, আয়েষা নবাবনন্দিনী। ইহা ছাড়া, স্কটের সহিত বঙ্কিমের রচনা-প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। স্কটের কৃতিত্ব ইতিহাস-পরিবেশ রচনায়, নিজের দেশের কৃষক ও অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর চরিত্রের সরস চিত্রণে; নায়ক-নায়িকার চরিত্র-সৃষ্টি ও গভীর ভাবাবেগ বর্ণনায় তাঁহার অক্ষমতা সুস্পষ্ট। বঙ্কিমের ইতিহাস অধিকাংশ স্থলে ক্ষীণ ও কাল্পনিক। নিম্নশ্রেণীর চরিত্র-চিত্রণে তাঁহার বিশেষ কোন কৃতিত্ব নাই। কিন্তু ভাব-গভীরতা ও কল্পনা-সমৃদ্ধির দিক দিয়া তাঁহার স্থান স্কটের অনেক ঊর্দ্ধে। তাঁহার বর্ণনাভঙ্গি, জীবন-সমালোচনা, মনুষ্য-জীবনে নিগূঢ় দৈবের লীলা ফুটাইয়া তোলার প্রণালী, সরস কথোপকথন-চাতুর্য্য, ভাবোচ্ছ্বাস—এ সমস্তই তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব ও প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের উপযুক্ত। পরিধির সঙ্কীর্ণতা ও সংঘাতের স্থায়িত্ব-কাল বাদ দিলে বঙ্কিম যে কোন প্রথম শ্রেণীর ইংরেজ ঔপন্যাসিকের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ। উপন্যাসের কাঠামো ও পটভূমি তিনি পশ্চিম হইতে গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সৃষ্ট নরনারীর সমস্যা সম্পূর্ণরূপে এতদ্দেশীয়, বঙ্গদেশের সমাজ ও পরিবার-প্রতিবেশ হইতে নিতান্ত স্বাভাবিক কারণে উদ্ভূত। ইউরোপীয় সমস্যা বাঙ্গালীর পোষাকে সাজাইয়া, বাঙ্গালীর ব্যবহার ও ব্যক্তিগত জীবনকে ইউরোপীয় সমাজনীতি ও দার্শনিক মতবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া বঙ্কিম সস্তায় বাহাদুরি লইবার কোন প্রবৃত্তি দেখান নাই। তাঁহার ভ্রমর-সূর্য্যমুখীর অভিমান স্নিগ্ধ ও উত্তাপহীন—কেন না, তাহারা চিরন্তন সমাজনির্দ্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্ত্তিত হইয়াছে; কক্ষচ্যুত তারকার উল্কাগতি ও অস্বাভাবিক প্রখর দীপ্তি তাহাদের নাই। বঙ্কিম-প্রতিভার বিশ্লেষণ-কালে তাঁহার মৌলিকতার এই শ্রেষ্ঠ গৌরব আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

বঙ্কিমের তৃতীয় কৃতিত্ব এই যে, তিনি বঙ্গ-সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্মদাতা। এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের সাধারণ পরিকল্পনার জন্য তিনি যে স্কটের নিকট ঋণী, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইতিহাস ও ব্যক্তিগত জীবনের সম্মিলনের উপর এই-জাতীয়

উপন্যাসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত—এই মূলসূত্র সমস্ত পরবর্ত্তী ঔপন্যাসিক স্কটের নিকট শিক্ষা করিয়াছে। বঙ্কিমের ইতিহাস-পরিধি দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয় হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর পর্য্যন্ত প্রসারিত। অবশ্য তাঁহার ঐতিহাসিক চিত্রের মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ফাঁক আছে। পাশ্চাত্য আদর্শের সহিত তুলনায় তাঁহার ইতিহাস দায়িত্বজ্ঞানহীন কাল্পনিকতা ও তথ্যহীন সঙ্কেতের পর্য্যায়ে পড়ে। কিন্তু ইহার জন্য দায়িত্ব বঙ্কিমের নহে; কেন না, এই মন্দভাগ্য দেশে বিশ্বাসযোগ্য, তথ্যবহুল ইতিহাসের একান্ত অভাব। ইতিহাসের অভাব ছাড়া আর একটি কারণে বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসের রস জমাট বাঁধিবার অবসর পায় নাই, তাহা সাধারণ দেশবাসীর ঐতিহাসিক আন্দোলনের সহিত সম্পর্কহীনতা ও অসহযোগ। দেশে যখন রাষ্ট্রবিপ্লব আসিয়াছে, তখন তাহা রাজা বা রাজবংশীয়দের ভাগ্যকে বিড়ম্বিত করিয়াছে, কিন্তু সাধারণ পারিবারিক জীবন এই ঝটিকায় বিপর্য্যস্ত হয় নাই, নিজ চিরন্তন নিস্তরঙ্গ স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে। বঙ্কিমের সমস্ত উপন্যাসে ইতিহাস-প্রভাব তুল্যরূপ প্রবল বা গভীর হয় নাই, ইতিহাস-অংশের সহিত ব্যক্তিগত জীবন সব ক্ষেত্রে সমান নিবিড়ভাবে বিজড়িত হয় নাই। এই সমস্ত ক্ষেত্রে অনৈতিহাসিকতা সেরূপ মারাত্মক ত্রুটি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তুর্ক-বিজয়ের সহিত হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর প্রেমের সম্বন্ধ অতি ক্ষীণ; পশুপতি-মনোরমার রহস্যজড়িত সম্পর্কের সহিত ইহা বরং অপেক্ষাকৃত নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। তুর্ক-বিজয়ের সময় দেশের সাধারণ অবস্থা কিরূপ ছিল বা তাহার অব্যবহিত কারণ কি, তাহার কোন সন্তোষজনক বিবরণ ইতিহাসেও নাই—সুতরাং বঙ্কিমের উপন্যাসে যে থাকিবে না, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে! তবে গৌড় অধিকার ও লুণ্ঠনের চিত্রটি যেন আগ্নেয় অক্ষরে লিখিত হইয়াছে, এখানে আশ্চর্য্য স্বচ্ছ ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কল্পনা ইতিহাস-জ্ঞানের অভাব পূর্ণ করিয়াছে। আর সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক গৌড়-বিজয়ের কিম্বদন্তীর অন্তরালে অবিসংবাদিত বিশ্বাসঘাতকতার যে কঙ্কাল উঁকি মারিতেছে, বঙ্কিম তাহাতে রক্ত-মাংস যোগ করিয়া, একটু আত্মঘাতী হীন চাতুর্য্য ও প্রণয়াকাঙ্ক্ষা মিশাইয়া পশুপতিরূপে দাঁড় করাইয়াছেন। পশুপতি ঐতিহাসিক চরিত্র নহে, কিন্তু সে না হইলে ইতিহাসের পাদপূরণ হয় না। 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'কপালকুণ্ডলা' সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে ইতিহাসের প্রাধান্য; ইতিহাসের ঝটিকাবর্ত্ত নায়ক-নায়িকাকে পরস্পরের সম্মুখীন করিয়া তাহাদের জীবনে প্রেমের অগ্নিশিখা জ্বালিয়াছে। উপন্যাসে ষোড়শ শতাব্দীর কোন সামাজিক চিত্র নাই—তবে chivalry বা ক্ষাত্রযুগের একটা মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য চিত্র পাওয়া যায়। পাঠান-মোগল-রাজপুতের জাতিগত বৈষম্য দেখানো হয় নাই, তবে কতলু খাঁ ও ওসমানের চরিত্রে দুর্দ্দমনীয় অসংযত আবেগের বিবরণে জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কিছু

পরিচয় মিলে। বিমলার অসমসাহসিকতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ব্যক্তিগত গুণ হইলেও কালপ্রভাবেরও ইঙ্গিত বহন করে। আর বিমলার সহিত বীরেন্দ্রসিংহের সম্পর্কে ও অভিরাম স্বামীর আত্ম-কাহিনীতে যে সামাজিক দুর্নীতি ও শিথিলতার ছবি পাওয়া যায়, তাহাকে মোটামুটি যুগধর্ম্মব্যঞ্জক বলিয়া মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। 'কপালকুণ্ডলা'তে ইতিহাস অত্যন্ত গৌণ—মতিবিবিকে প্রথম নুরজাহানের প্রতিদ্বন্দ্বিনী, পরে নবকুমারের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী করিয়া দেখানোতে প্রকারান্তরে নবকুমারের গৌরববৃদ্ধির ব্যবস্থা হইয়াছে। কপালকুণ্ডলা যে রাজ্যের অধিবাসিনী, ইতিহাসের সন তারিখ মিলাইয়া তাহার সীমা-নির্দ্দেশ করা যায় না। 'রাজসিংহ' সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক উপন্যাস—ইহার মধ্যে দিল্লী-সম্রাটের ঐশ্বর্য্যসমারোহপূর্ণ রাজসভা ও পারিবারিক জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতপূর্ণ হৃদয়বিক্ষোভ চিত্রিত হইয়াছে। সাধারণ লোকের কথা ইহাতে নাই; কিন্তু রাজনৈতিক কূট-ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধ-বিগ্রহের মাঝে যে সনাতন মানব-হৃদয় রাজ-পরিচ্ছদের অন্তরালে তাহার চিরন্তন ক্ষুধা-আকাঙ্ক্ষা-অভিমান, মনোবেদনা লইয়া আন্দোলিত, তাহাই প্রকটিত হইয়াছে। তাহার পর বঙ্কিম একেবারে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আসিয়া পড়িয়াছেন। 'সীতারামে' ধ্বংসোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের অরাজকতা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস বর্ণিত হইয়াছে। এখানে সাধারণ জীবন-যাত্রার আমরা যে পূর্ণতর চিত্র পাই, তাহার কারণ ইহার সহিত আমাদের বর্ত্তমান যুগের বিশেষ প্রভেদ নাই। গঙ্গারামের কৃতঘ্নতা, রমার ভাববিহ্বলতা, সীতারামের পদস্খলন—এ সমস্তই প্রায় আমাদের আধুনিক জীবনের প্রতিচ্ছবি বলিয়াই অনুভূত হয়। সীতারাম যে বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন ছাড়াইয়া জাতিগত জীবনে শিকড় গাড়িতে পারে নাই; কাজে কাজেই, তাঁহার চরিত্রের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণস্থায়ী স্বাধীনতাও অন্তর্হিত হইয়াছে। সাধারণ প্রজার শোচনীয় ঔদাসীন্য রামচাঁদ-শ্যামচাঁদের নিরুদ্বেগ নির্লিপ্ত ব্যবহারে নির্ভুলভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। আধুনিক সীতারাম কামান দাগেন না, ব্যবস্থা-পরিষদে বক্তৃতা করেন, কিন্তু নেতৃত্বের অভাবে প্রতিষ্ঠান ভূমিসাৎ হওয়ার ব্যাপারে আমরা সীতারামের যুগের অধিক অগ্রসর হই নাই।

'চন্দ্রশেখরে' ইংরেজ রাজত্বের প্রথম ভিত্তি-পত্তনের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু ইতিহাস এখানে সুদূর দিক্‌চক্রবালের মত উপন্যাসকে নির্লিপ্তভাবে বেষ্টন করিয়া আছে। ইতিহাস-সূত্রে ইংরেজের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, ঐতিহাসিক চরিত্র মীরকাসিম নিয়তির দুশ্ছেদ্য বন্ধনরজ্জুতে দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের সহিত একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ইতিহাসের আর বিশেষ প্রাধান্য নাই। ভাগীরথীতীরস্থ বেদগ্রামের সামাজিক জীবন, প্রতাপ-শৈবলিনীর নির্দ্দোষ সুখস্বপ্নময় কৈশোর-প্রণয়—এ সমস্তই আমাদের সুপরিচিত; অতীতের কুহেলিকাভেদকারী দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে ইহাদিগকে চিনিয়া লইতে হয় না।

সুতরাং বঙ্কিম এখানে পরিচিত ভূখণ্ডেই পদক্ষেপ করিয়াছেন। মীরকাসিমের চরিত্র, গুরগন খাঁর বিশ্বাসঘাতকতা, ইংরেজ বণিকের দৃপ্ত শৌর্য্য ও আত্মপ্রত্যয়—এইগুলি বঙ্কিমের ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টির সুন্দর পরিচয়। 'আনন্দমঠ' ঠিক ইহার অব্যবহিত পরের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছে। এখানকার আকাশ-বাতাস আদর্শলোকের অপার্থিব জ্যোতিতে পরিব্যাপ্ত। এই ইন্দ্রজালমণ্ডিত ভূমিখণ্ডে ইতিহাসের পরিচয়পত্র লইয়া প্রবেশলাভ করা যায় না। এখানে অতীতের ছদ্মবেশে দেশ-প্রেমিকের কল্পনা-প্রসূত সোনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, কাজেই ইহা ইতিহাস-রাজ্যের বহির্ভূত। পদচিহ্ন গ্রামে কোন কৌতূহলী পথিকের পদ-চিহ্ন পড়িবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর যে শুষ্ক শীর্ণ কঙ্কাল-কণ্টকিত পটভূমিতে এই সোনার ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা ঐতিহাসিক সত্য ও ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার সহিতই চিত্রিত হইয়াছে। 'দেবী চৌধুরাণী' আর একটু পরের সময়ের প্রতিকৃতি। এখানেও ঐতিহাসিক পটভূমিতে আদর্শবাদের মূর্ত্তি-স্থাপন লেখকের উদ্দেশ্য। তবে প্রফুল্ল তাহার নিষ্কাম ধর্ম্মে শিক্ষা-দীক্ষা সত্ত্বেও সন্তান-সম্প্রদায়ের মত একেবারে কল্পলোকের উচ্চস্বর্গে বিচরণ করে না। সে রাষ্ট্রবিপ্লবের সিংহাসন হইতে বাঙ্গালী পরিবারের গৃহকর্ত্রীর পদে নামিয়া আসিয়াছে। ভবানী পাঠকের কল্পনা সত্যানন্দের মত এরূপ আকাশ-স্পর্শী নহে। প্রফুল্লর জীবন-সমস্যা খাঁটি আধুনিক যুগের জিনিস। হরবল্লভ আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। 'দেবী চৌধুরাণী'র ইতিহাসাংশ বাঙ্গালায় ইংরেজ-শাসনের দৃঢ়ীকরণের প্রথম যুগের ব্যাপার, সুতরাং এখানে ঐতিহাসিক প্রায় সমসাময়িক প্রত্যক্ষদর্শী। অরাজকতা দমন ও শান্তি স্থাপনের জন্য ইংরেজের ব্যর্থ প্রয়াসই দেশের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা সূচিত করে। এই বিশৃঙ্খল যুগের এলোমেলো বাতাসে একজন গৃহস্থ-বধূ দস্যুদলনেত্রীতে রূপান্তরিত হইয়াছে, ইহাই এ যুগের ইতিহাস-প্রভাবের বিশেষ পরিচয়। বঙ্কিমের ইতিহাস ত্রুটিবহুল ও অনেকাংশে অনুমানসিদ্ধ, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে। তথাপি তিনি ও রমেশচন্দ্র ছাড়া আর কেহ অতীতের মানবিকতা ফুটাইতে চেষ্টা করেন নাই, ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

সর্ব্বশেষ কথা—বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা উপন্যাসের যে অদ্ভুত রূপান্তর সাধন করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার কীর্ত্তিসৌধের ভাস্বর স্বর্ণচূড়া। উপন্যাসের চরম কৃতিত্ব মানুষের ক্ষুদ্র জীবনের সমস্যা-সংঘাতগুলিকে মহান্ ও গৌরবময় প্রতিপন্ন করা, মনুষ্য-জীবনের জটিল দুর্জ্ঞেয়তাকে —ইহার পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তির মধ্যে দেবাসুরের সংগ্রামের তীব্রতাকে ফুটাইয়া তোলা। এই বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তীদের সহিত তুলনায় বঙ্কিমের কীর্ত্তি স্বতঃই প্রতিভাত হইবে। বঙ্কিমের পূর্ব্ববর্ত্তী উপন্যাসের মধ্যে 'আলালের ঘরের দুলালে'র স্থানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কিন্তু বঙ্কিমের উপন্যাসের সঙ্গে ইহার কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ! 'আলালের ঘরের দুলাল' এক প্রকার

মিশ্র ও গঠনসামঞ্জস্যহীন রচনা ; ইহার মধ্যে বাস্তব-বর্ণনা, সরস কথ্য ভাষার সহযোগে ঘটনা-বিবৃতি, চরিত্র-চিত্রণ, নীতিপ্রচার-মূলক বাগাড়ম্বর প্রভৃতি নানাবিধ বস্তুর অদ্ভুত সংমিশ্রণ বিদ্যমান। ইহাকে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস না বলিয়া উপন্যাসের ভ্রূণাবস্থা বলা যাইতে পারে। ঔপন্যাসিকের কেন্দ্রানুগ দৃষ্টি, ঐক্যবিধায়ক মনন-শক্তির এখানে একান্ত অভাব। লেখক কতকটা শিশুর মত চোখের সামনের যে দৃশ্য, তাহা দ্বারাই আকৃষ্ট হইয়া অসংলগ্ন-ভাবে টীকা-টিপ্পনী-মন্তব্য যোজনা করিয়া কলানৈপুণ্যের দিক দিয়া নিজের শৈশবোচিত অপরিণতির পরিচয় দিয়াছেন। মতিলালের দুর্দ্দশা ও অনুতাপ, রামলালের মহানুভবতা, ভ্রাতাদের পুনর্ম্মিলন—এ সমস্তই যেন লঘু হালকা ভাবে আমাদের স্পর্শ করে—এ যেন রূপকথার দায়িত্বহীন, সুলভ নীতি-নিয়ন্ত্রিত, 'সব ভাল যার শেষ ভাল'-জাতীয় জীবনযাত্রারই একটা বাস্তবতর সংস্করণ। 'আলালের ঘরের দুলাল' পড়িয়া কি আমাদের জীবনের অপরিমেয় রহস্যময়তা সম্বন্ধে কোন ধারণা হয় ? এই বিষয়ে বঙ্কিমের উপন্যাসের প্রভাব সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়। তাঁহার অপরিণত রচনাও আমাদের অন্তরে এক গভীর সুরের রেশ ধ্বনিত করে। আয়েষার ব্যর্থ প্রেম একটি জলভারনত বর্ষণোন্মুখ মেঘের মতই আমাদের অন্তরতলে ছায়াপাত করে। উদার মনোবৃত্তির সহিত নৈরাশ্যময় বিফলতার বিধিনির্দ্দিষ্ট সংযোগ উপলব্ধি করিয়া মন সম্ভ্রম-বিস্ময়ে অবনত হয়। কপালকুণ্ডলার জীবনের অতর্কিত পরিসমাপ্তি সমাধানহীন প্রশ্নের মতই আমাদের অন্তরদ্বারে করাঘাত করিতে থাকে। সমুদ্রের ঢেউ একদিন যাহাকে লোকালয়ের বালুকাতটে শোয়াইয়া দিয়া গিয়াছিল, জাহ্নবী-তরঙ্গের আর একটি উচ্ছ্বাস আসিয়া তাহাকে আবার সেই অজানা দেশে ভাসাইয়া লইয়া গেল—ইহার আবেদন রবীন্দ্রনাথের এক ভাবব্যঞ্জনাময় কবিতার সুরের মত আমাদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করে। মানস-ব্যভিচার আমাদের এই পবিত্রতাস্পর্দ্ধী সমাজেও নিতান্ত বিরল নহে ; এবং যে পাপ মনের সীমা ছাড়াইয়া কর্ম্মরাজ্যে পদক্ষেপ না করে, তাহা আমাদের অত্যন্ত কঠোর নীতিবায়ুগ্রস্ত সমালোচকেরও দৃষ্টি এড়াইয়া থাকে। কিন্তু বঙ্কিম শৈবলিনীর এই মানস-পাপের যে আশ্চর্য্য প্রায়শ্চিত্ত-বিধান করিয়াছেন, তাহার অনুভূতির মধ্যে অনুতাপের যে প্রখর বহ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়াছেন, তাহা আমাদের বিস্ময়স্তব্ধ-দৃষ্টির সম্মুখে বিভীষিকাময় নরকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে, ও এক সূক্ষ্মতর অমোঘতর বিচার-বিধানের আদর্শ সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন করিয়াছে। 'চন্দ্রশেখর' পাঠের পর আমাদের কণ্ঠাগ্রে শেক্সপীয়রের সেই অমর উক্তি 'There are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy, Horatio' উচ্চারিত হইতে থাকে। দাম্পত্য-কলহ আমাদের সমাজে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার, এবং এক প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকে ইহাকে 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া'র পর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র

তাঁহার 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' এই প্রচলিত প্রবাদবাক্যের নিরসন করিয়াছেন। যে কেহ নগেন্দ্রনাথের অনুতাপদিগ্ধ বিরহ-ব্যাকুলতা, ভ্রমরের অভিমান-দুর্ব্বিষহ দীর্ঘ-প্রতীক্ষার সহিত পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই আর এই লঘু প্রবাদবাক্যে আস্থা স্থাপন করিতে পারিবেন না। দীর্ঘ দাম্পত্য-প্রেমের পর নগেন্দ্রনাথের ও গোবিন্দলালের প্রলোভন ও পদস্খলন মানব-মনের দুর্জ্ঞেয়তা, নানা বিরোধী শক্তির সমবায়-ফলে ইহার চাঞ্চল্য ও আদর্শচ্যুতি, আকর্ষণের প্রবলতা ও মোহভঙ্গের তীব্রতা সম্বন্ধে এক অভিনব আলোকপাত করে। এইরূপে বঙ্কিমের প্রত্যেক উপন্যাসই আমাদের উপেক্ষিত অবজ্ঞাত মানব-জীবনের উপর এক অপরূপ অর্থ-গৌরব ও ভাব-মাহাত্ম্যের আরোপ করিয়াছে, রাস্তার ধূলিকণার উপর স্নিগ্ধ সমবেদনার শিশিরবিন্দুসম্পাতে ইহাকে মহিমান্বিত করিয়াছে। উপন্যাসের এই উচ্চতর পর্য্যায়ে উন্নয়নই বঙ্কিমের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি—তাঁহার হাতে উপন্যাস অখ্যাত জীবনযাত্রার বিবৃতি হইতে মহাকাব্যের ব্যাপ্তি ও বিশালতা লাভ করিয়াছে। তাঁহার উচ্চারিত 'বন্দে মাতরম্' কেবল ভাবসর্ব্বস্ব, কল্পনাবিলাসীর উচ্ছ্বাসোক্তি নহে; তিনি সাধারণ জীবনের নিগূঢ় মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই সমগ্র দেশের মধ্যে মাতৃমূর্ত্তির বিরাট সাঙ্কেতিকতা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি জীবানন্দের ন্যায় পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা আঁকিয়াছিলেন বলিয়া তাহাদের গর্ভধারিণীকেও রত্নপ্রসবিনী রত্নসিংহাসনরূঢ়া মূর্ত্তিতে কল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই কালজয়ী মহামন্ত্র উচ্চারণের পূর্ব্বে তাহার ভিত্তিস্বরূপ তাঁহার প্রতিভার অপর দিকটাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। ঔপন্যাসিক বঙ্কিম দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনামার্গের নির্দ্দেশক ও সিদ্ধির উত্তরসাধক।

বঙ্কিমচন্দ্রের ছাত্রজীবন

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৩৮ সনের ২৬এ জুন কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। ১৮৪৪ সনে তিনি মেদিনীপুরে আসিয়া ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হন; তাঁহার পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখন মেদিনীপুরের ডেপুটি কলেক্টর। ইহার পর ১৮৪৯ সন হইতে বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায় থাকিয়া হুগলী কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। হুগলী কলেজের পাঠ শেষ করিয়া তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন ও তথা হইতে বি-এ পরীক্ষা দেন। তাঁহার ছাত্রজীবন সম্বন্ধে ইহার অতিরিক্ত কোন সংবাদ আমাদের অজ্ঞাত ছিল—প্রচলিত কোন বঙ্কিম-জীবনীতেও তাহা পাই নাই।

হুগলী কলেজে অধ্যয়ন

হুগলী কলেজের পুরাতন নথিপত্র সযত্নে অনুসন্ধান করিলে হুগলী কলেজে বঙ্কিমচন্দ্রের ছাত্রজীবন সম্বন্ধে নূতন কিছু জানা যাইতে পারে। হুগলী কলেজের পুরাতন নথিপত্র—কলেজের শিক্ষকবর্গের মাহিনার ও বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের বৃত্তির রসিদ-বই, এবং ছাত্রদের হাজিরার ও ভর্ত্তি করিয়া লইবার খাতা, চিঠিপত্র প্রভৃতি—এখনও প্রায় সম্পূর্ণ অবস্থাতেই আছে। এই সকল উপকরণ হইতে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন তথ্য পাওয়া গিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজে (তখন 'মহম্মদ মহসিনের কলেজ' নামেও পরিচিত) প্রবেশ করেন ২৩ অক্টোবর ১৮৪৯ তারিখে; তখন তাঁহার বয়স সাড়ে এগার বৎসর। তাঁহাকে প্রথমে হুগলী কলেজের স্কুল-বিভাগেই প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে হুগলী কলেজের ইংরেজী-বিভাগ—কলেজ ও কলিজিয়েট স্কুলে ভাগ করা ছিল। কলেজে চারিটি শ্রেণী ছিল। স্কুলটি আবার দুইটি ভাগে—সিনিয়র ডিবিসন, সেক্‌শ্যন A, তিনটি শ্রেণীতে; এবং জুনিয়র ডিবিসন, সেক্‌শ্যন B, চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।*

সম্প্রতি 'মাসিক মোহাম্মদী' প্রচার করিতেছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে বিনা-বেতনে মুসলমান-প্রতিষ্ঠিত 'মহসিন কলেজে' শিক্ষালাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে

* K. Zachariah : *Hist. of Hooghly College*, p. 45.

এ কথাটি সত্য নহে। তিনি বাল্যকালে মহসিন কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিনা-বেতনে নহে। হুগলী কলেজে প্রথমে সকল ছাত্রকেই বিনা-বেতনে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু ১৮৪৬ সনের জানুয়ারি মাস হইতে শিক্ষা-পরিষদ্—কাউন্সিল অব এডুকেশন সাধারণ ভাবে এই নিয়ম জারি করেন যে, জুনিয়র সিনিয়র সকল বিভাগের ছাত্রকেই বেতন দিতে হইবে; অবশ্য বেতন দিতে একান্ত অক্ষম দরিদ্র ছাত্রের কথা স্বতন্ত্র। শিক্ষা-পরিষদ্ কর্ত্তৃক এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইবার তিন বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজে যোগদান করেন। তিনি যথারীতি বেতন দিয়াই হুগলী কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তখন জুনিয়র-বিভাগের ছাত্রদিগকে মাসিক দুই টাকা এবং সিনিয়র-বিভাগের ছাত্রদিগকে মাসিক তিন টাকা বেতন দিবার রীতি ছিল।* বঙ্কিমচন্দ্র যে অবৈতনিক ছাত্র ছিলেন না, তাহার আরও একটি প্রমাণ—১৮৫০-৫৪ সনে যে-সকল ছাত্র বিনা-বেতনে হুগলী কলেজে অধ্যয়ন করিত, তাহাদের নামের তালিকা এখনও হুগলী কলেজের পুরাতন নথিপত্রের মধ্যে আছে, কিন্তু তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র আগাগোড়াই কৃতী ছাত্র ছিলেন। হুগলী কলেজের ১৮৫০-৫১ সনের বার্ষিক বিবরণে প্রকাশ, তিনি "৩য় শ্রেণী, সিনিয়র ডিবিসন, সেক্শ্যন A"-র ছাত্র হিসাবে সাধারণ পারদর্শিতার দিক্ দিয়া পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

তখনও এনট্রান্স বা বি-এ পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয় নাই; ছাত্রেরা জুনিয়র ও সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দিত। ১৮৫৪ সনের এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্র জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দেন। পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া দুই বৎসরের জন্য মাসিক ৮ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। এই পরীক্ষায় তিনি ৩০০ নম্বরের মধ্যে ২৭৫·৫ পাইয়াছিলেন; তন্মধ্যে ব্যাকরণে ৪৫, ইতিহাসে ৪১, গণিতে ৩০, ভূগোলে ৪৬, সাহিত্যে ৪০, অনুবাদে ৩৪½, এবং মৌখিক পরীক্ষায় ৩৯। যাদবচন্দ্র রায় দ্বিতীয় হন, তিনি পাইয়াছিলেন ২২৯·২৫; ইহা ছাড়া শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, নবকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি আরও কয়েক জন বঙ্কিমের সহিত জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিয়াছিলেন। সে সময়ের নিয়ম অনুযায়ী বৃত্তিধারী ছাত্রদের বেতন দিতে হইত না,† সুতরাং পরবর্ত্তী দুই বৎসর বঙ্কিমের বেতন দিবার প্রয়োজন হয় নাই।

---

* "In January 1846 new rules were issued by the Council. No student was to be admitted to the College or promoted to its senior department who could not pay for his education, the fees being fixed at a minimum of R 3 for the senior and R 2 for the junior department. Special cases were dealt with by a committee of masters."—K. Zachariah: *Hist. of Hooghly College*, p. 23.

† "...holders of scholarships paid no fees..."—*Ibid.*, p. 50.

১৮৫৬ সনের এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্র সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দেন। পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া তিনি দুই বৎসরের জন্য মাসিক ২০ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। এখানে বলা প্রয়োজন, কলেজ-বিভাগে তখন চারিটি শ্রেণী ছিল, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সব কয়টি শ্রেণীতে না পড়িয়াই সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী জুলাই মাসের ১২ই তারিখে (১৮৫৬) বমিমচন্দ্র হুগলী কলেজ ত্যাগ করেন, * এবং আইন পড়িবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। †

বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজে স্কুল-বিভাগের সিনিয়র ডিবিসনে ও কলেজ-বিভাগে যে-সকল অধ্যাপকের নিকট পাঠাভ্যাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম জানিবার জন্য অনেকের কৌতূহল থাকিতে পারে। এই কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আমরা হুগলী কলেজের পুরাতন নথিপত্র হইতে অধ্যাপকবর্গের নাম সংগ্রহ করিয়াছি।

১৮৪৯-৫৩ সনে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজের স্কুল-বিভাগে নিম্নলিখিত অধ্যাপকদের নিকট পড়িয়াছিলেন :—

১। মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
২। টি. ডবলিউ. ক্লারমণ্ট (T. W. Clermont)
৩। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৪। ডবলিউ. ব্রেনাণ্ড (W. Brennand)

১৮৫৪-৫৬ সনে তিনি যে-সকল অধ্যাপকের নিকট পড়েন, তাঁহারা—

১। রবার্ট থোয়েট্স্ (Robert Thwaytes)
২। জেম্স গ্রেভ্স (James Graves)—হেড মাষ্টার
৩। ই. লজ (E. Lodge)

---

* বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্কিম-জীবনী'তে (৩য় সং. পৃ. ৭৭) ভ্রমক্রমে লিখিয়াছেন, "১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।" ৭৪ পৃষ্ঠাতেও এইরূপ উক্তি আছে। ডক্টর জয়ন্তকুমার দাশগুপ্তও তাঁহার পুস্তকে এই ভুলের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।

† হুগলী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ কে. জেকেরিয়া সরকারী দলিলাদি ও কলেজের নথিপত্র অবলম্বনে হুগলী কলেজের একখানি ইতিহাস লিখিয়াছেন ; তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত অংশটি আছে :—

"Hurro Chunder Ghose and Ganga Churn Sircar were both thrown into the shade by another student of the College, Bunkim Chunder Chatterjee. At College he was easily the best man of his year. In 1854 he was first in the junior scholarship examination with 275·5 marks, while the second obtained only 229·25. He outdistanced his fellows again in the senior scholarship examination. In 1856 he, like Dwarkanath, joined the Presidency College to study law and he was one of the first graduates of the new University." P. 52.

৪। ডি. ফোগো (D. Foggo)

৪। অধ্যক্ষ জে. কার্ (Principal J. Kerr)

১৮৪৯-৫৬ সনের মধ্যে তিনি বাংলা-বিভাগের যে-সকল পণ্ডিতের নিকট পাঠ লইয়াছিলেন, তাঁহারা—

১। অভয়াচরণ তর্কপঞ্চানন—সুপারিন্‌টেণ্ডিং পণ্ডিত

২। গোবিন্দচন্দ্র শিরোমণি—হেড পণ্ডিত

৩। ভগবানচন্দ্র বিশারদ—সেকেণ্ড পণ্ডিত

৪। কাশীনাথ তর্কভূষণ

৫। গোবিন্দচন্দ্র বিশারদ

৬। গোপালচন্দ্র বিদ্যানিধি

প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন

১৮৫৭ সনে এনট্রান্স ও ১৮৫৮ সনে বি-এ পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। ১৮৫৭ সনের এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন-বিভাগ হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দিলেন। তিনি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সে-বৎসর উত্তরপাড়া স্কুল হইতে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত কলেজ হইতে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, এবং হিন্দু স্কুল হইতে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতিও এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সর্ব্বসমেত ২৪৪ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে প্রথম বিভাগে ১১৫ জন ও দ্বিতীয় বিভাগে ৪৭ জন উত্তীর্ণ হয়। তৃতীয় বিভাগ বলিয়া তখন কিছু ছিল না। যাহারা সর্ব্বসাকল্যে অর্দ্ধেক বা তদূর্দ্ধ নম্বর পাইয়াছিল তাহারা প্রথম বিভাগে, এবং যাহারা অন্যূন এক-চতুর্থাংশ বা অর্দ্ধেকের কম নম্বর পাইয়াছিল, তাহারা দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়।*

১৮৫৭ সনের এনট্রান্স পরীক্ষায় বাংলা পাঠ্য ছিল—কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্'; পরীক্ষার বিষয়গুলি, পরীক্ষকদিগের নাম সমেত, নিম্নে দেওয়া হইল :—

English, Greek and Latin	G. Smith, Esq., Principal, Doveton College.
Sanscrit, Bengali and Hindee	The Revd. K. M. Banerjee, Professor, Bishop's College.
History and Geography	E. B. Cowell, Esq., M.A., Professor, Presidency College.
Mathematics and Natural Philosophy	W. Masters, Esq., Professor, Metropolitan College.

—University of Calcutta. Minutes for the Year 1857. p. 124.

* University of Calcutta. Minutes for the Year 1857. P. 65.

প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়িতে পড়িতে পর-বৎসর—১৮৫৮ সনে বঙ্কিমচন্দ্র বি-এ পরীক্ষা দিবার সঙ্কল্প করিলেন। ১৮৫৮ সনের এপ্রিল মাসের গোড়ায় সর্ব্বপ্রথম বি-এ পরীক্ষা হইল। সর্ব্বসমেত ১০ জন ছাত্র বি-এ পরীক্ষা দিয়াছিল; তন্মধ্যে কেবল মাত্র দুই জন—বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ বসু দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম স্থান এবং যদুনাথ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ইহারা দুই জনেই প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র—বঙ্কিমচন্দ্র আইন-বিভাগের, যদুনাথ জেনারেল ডিপার্টমেণ্টের। পরীক্ষা কঠিন হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ ছয়টি বিষয়ের মধ্যে পাঁচটিতে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন, কিন্তু ষষ্ঠটিতে তাঁহারা উভয়েই অনধিক ৭ নম্বর কম পাইয়া ফেল হন। ২৪ এপ্রিল ১৮৫৮ তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের অধিবেশনে পরীক্ষকমণ্ডলীর সুপারিশ অনুযায়ী ঐ দুই জনকে ৭ নম্বর 'গ্রেস' দিয়া বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া বিবেচিত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। *

বি-এ পরীক্ষায় ইংরেজী অবশ্যপাঠ্য বিষয় ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রকে শেক্সপীয়রের *Macbeth*, ড্রাইডেনের *Cymon and Iphigenia*, অ্যাডিসনের *Essays* প্রভৃতি পড়িতে হইয়াছিল। বাংলায় পাঠ্য ছিল—মহাভারত (১ম তিন পর্ব্ব), 'বত্রিশ সিংহাসন', ও 'পুরুষপরীক্ষা'। বি-এ পরীক্ষার বিষয়গুলি, পরীক্ষকবর্গের নাম সমেত, নিম্নে দেওয়া হইল :—

English, Greek and Latin	W. Grapel, Esq., M. A., Presidency College.
Sanscrit, Bengali, Hindee and Oorya	Pundit Isserchunder Bidyasagar, Principal, Sanscrit College.
History and Geography	E. B. Cowell, Esq., M. A., Professor, Presidency College.
Mathematics and Natural Philosophy	The Revd. T. Smith, Professor, Free Church Institution.

---

* Minutes of the Syndicate, for the Year 1858. 24th April.

3. Read a letter from the University Board of Examiners in Arts, stating that of the 13 Candidates for the degree of B. A., three had been absent during the whole, or a portion of the Examination, and that of the others, all had failed.

Read also a letter from the like Board, recommending, that, two Candidates, viz. Bunkim Chunder Chatterjee and Judoonath Bose who had passed creditably in five of the six subjects, and had failed by not more than seven marks in the sixth, might, as a special act of grace, be allowed to have their degrees, being placed in the second division, it being clearly understood, that such favor should, in no case, be regarded as a precedent in future years.

RESOLVED :—That the two Candidates mentioned, be admitted to the degree of B. A. (University of Calcutta. Minutes for the Year 1858. Pp. 18-19.)

Natural History and Physical Sciences	H. S. Smith, Esq., B. A., Professor, Civil Engineering College.
Mental and Moral Sciences	The Revd. A. Duff, D. D.

—University of Calcutta. Minutes for the Year 1857. P. 125.

১১ ডিসেম্বর ১৮৫৮ তারিখে সিণ্ডিকেটের অধিবেশনে ভাইস-চ্যান্সেলার তাঁহার বার্ষিক অভিভাষণ পাঠ করিলে পর, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসুকে সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করেন। তৎপরে উভয়কেই বি-এ উপাধি প্রদত্ত হয়। *

১৮৫৮ সনের এপ্রিল মাসে বি-এ পরীক্ষা দিবার পর বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়িতে লাগিলেন। কলেজের হাজিরা-বইয়ে প্রকাশ, তিনি "3rd year Law Student" হিসাবে পরবর্ত্তী ৭ই আগষ্ট পর্য্যন্ত কলেজে হাজিরি দিয়াছিলেন। ইহার পর বঙ্কিমের আর কলেজে উপস্থিত হইতে হয় নাই ; তিনি যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর হইয়াছিলেন।

চাকুরী করিতে করিতে ১৮৬৯ সনের জানুয়ারি মাসে বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষা দিয়াছিলেন। পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

বি-এল পরীক্ষায় কি কি বিষয়ে প্রশ্নপত্র ছিল, তাহার একটি তালিকা—পরীক্ষকদিগের নাম-সমেত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৬৮-৬৯ সনের ক্যালেণ্ডার হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

Jurisprudence	Mr. C. J. Wilkinson
Personal Rights and Status	do.
The Law of Contracts	do.
Rights of Property	Mr. W. Jardine, M. A., LL. M.
Procedure and Evidence	do.
Criminal Law	do.

* Minutes of the Syndicate, for the Year 1858. The 11th December. P. 121.

বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীসজনীকান্ত দাস

ঘোর দুর্গম অতি বিস্তার গভীর অরণ্যানী—
গর্ব্বিত শিরে দাঁড়াইয়া আছে হাজার বনস্পতি ;
শাল্মলী শাল শিশু তিন্তিড়ি আম্র পনস দেবদারু সারে সার।
পাতায় পাতায় মেশামেশি হয়ে চলে অনন্ত শ্রেণী,
বিচ্ছেদহীন ছিদ্রবিহীন রবিরশ্মির নাহি অবকাশ-পথ ;
বায়ু-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত শতক্রোশব্যাপী বারিধি পল্লবের—
এপারে উঠিয়া ওপারে ভাঙিছে সুদূরপ্রসারী সবুজ পাতার ঢেউ,
অতল নিম্নে গহন অন্ধকার,
অমাবস্থার তিমির-রাত্রি সূর্য্যদীপ্ত প্রখর দ্বিপ্রহরে,
অস্ফুট আলো—আঁধার ভয়ঙ্কর।
বৃক্ষপত্র-মর্ম্মর আর নিম্নে শ্বাপদ, কুলায়ে কুলায়ে পাখী—
থাকিয়া থাকিয়া আর্ত্তকণ্ঠে উঠিছে তাদের বিলাপকাতর ধ্বনি,
যেতেছে গিলায়ে তরঙ্গহীন নৈঃশব্দ্যের মাঝে।

রাত্রি দ্বিপ্রহর।
তরল তিমির অরণ্যশাখে নিবিড় হয়েছে যেন,
জটিল হইয়া কাণ্ডে কাণ্ডে বেঁধেছে গ্রন্থি শত—
পায়ের তলায় সাপের মতন জড়াইয়া পাকে পাকে
রচিতেছে যেন কুটিল জটিল পিচ্ছিল শত বাধা।
স্তব্ধ এখন সে ঘোর অরণ্যানী—
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পশু কীট পতঙ্গ পক্ষী সে অগণন
আতঙ্কে যেন নিশ্বাস রুধি আছে।
অন্ধকার সে তবু হয় অনুভব,
অননুভব সে নিস্তব্ধতা শব্দিত পৃথিবীর।

বিদারণ করি নিশীথ তিমির
বিদারণ করি স্তব্ধতা ভয়াবহ
ব্যাকুলকণ্ঠে কে শুধায়, "প্রভু, হবে কি সিদ্ধ আমার মনস্কাম ?"
পড়িতে পড়িতে অজ্ঞাতসারে সে বনগহনে হারায়ে গেলাম পথ ;
শুনিনু কে যেন কাতরকণ্ঠে কাহারে শুধায় তিমির মথিত করি,
"হবে কি সিদ্ধ, হে প্রভু আমার, হবে কি সিদ্ধ একটি মনস্কাম ?"

রজনী জ্যোৎস্নাময়ী—
প্রান্তর-পথে চলিতেছিলাম প্রিয়সম্ভাষী ভবানন্দের সাথে,
মল্লার রাগে প্লাবিয়া আকাশ গাহিতেছিলেন গুরুগম্ভীর নাদে—
জন্মভূমির বন্দনা-গীতি সে 'বন্দে মাতরম্ ।'
নয়নে অশ্রু উথলি উঠিল মোর
লক্ষ স্বর্গ হতে গরীয়সী মহীয়সী মা আমার !
রজনী প্রভাত, বিজন কাননভূমি—
পক্ষীকূজনস্পন্দিত সেই নন্দিত বনভূমি,
'আনন্দমঠে' হরিণচর্ম্মে বসিয়া যেথায় সত্যানন্দ নিজে,
নিকটে কোথাও নাই 'সন্তান'দল ।
পরম আদরে দেখালেন মোরে মার মন্দিরে সুরঙ্গপথে ঢুকে,
মা যাহা ছিলেন, মা যাহা আছেন, যাহা হইবেন জগদ্ধাত্রী মাতা ।
সভয়ে চকিতে তাঁহারে প্রণাম করি
আর্ত্তকণ্ঠে গাহিতে গাহিতে তাঁর বন্দনা-গান,
'আনন্দমঠে' 'সন্তান'দলে লিখিয়া আপন নাম
ব্রহ্মচারীর চরণে বসিয়া দীক্ষিত হইলাম ।

মার সন্তান ফিরিতেছি পথে পথে—
মন্বন্তরে দুর্ভিক্ষের উঠিয়াছে হাহাকার,
মন্বন্তরে জাগিয়াছে মারীভয় ।
শব আছে, শুধু জ্বলে নাকো চিতা অধূম শ্মশানভূমি ;
রাজার শাসন তারি মাঝখানে ফিরিছে পীড়নরূপে,
শোষক ফিরিছে শাসক-ছদ্মবেশে ।

সহসা শূন্য ব্যেপে
গুড়ুম গুড়ুম ধ্বনিল কামান সম্মুখে আশেপাশে,
বিশাল কানন কম্পিত করি ধ্বনিল মুহুর্মুহু—
দূর নদীপথে ভেসে গেল তার ভীষণ প্রতিধ্বনি।
জননী-সেবার সন্তান মোরা চমকি জাগিনু মৃত্যু-আহব-মাঝে ;
ভগ্ন হস্ত, কর্ত্তিত পদ, মুখে অবিরাম সে 'বন্দে মাতরম্।'
মৃত্যুর মাঝে রাজায় প্রজায় শেষ হ'ল বোঝা-পড়া ;
অর্জ্জন কেহ করিনু পুণ্য, প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মরিনু কেহ—
মন্বন্তরে নূতন অভ্যুদয়।
সন্তান-নেতা সত্যানন্দ, কে মহাপুরুষ ধরিলেন তাঁর হাত,
লইয়া তাঁহারে গেলেন অসীম নিরুদ্দেশের পথে—
প্রতিষ্ঠা গেল আসিল বিসর্জ্জন।

*　　　*　　　*

ত্রিস্রোতা নদী, তারি তীরে তীরে অরণ্য সুগভীর,
গহনে তাহার সুরঙ্গপথে আঁধার ধরণীতলে
প্রস্তরে গড়া পুরাতন দেবালয়।
বনপথ ধরি একাকী চলিছে ভাঙা সেই দেবালয়ে
দস্যু-নেত্রী সে দেবী-চৌধুরাণী,
ধরাগর্ভের মন্দিরে যেথা দীপ জ্বলে মিটিমিটি।
সে মৃদু আলোকে দেখি স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গের পূজা,
পূজারী দস্যু ভবানী পাঠক নিজে।
বাঙালী মেয়ের রূপ দেখিলাম দস্যু-নেতার চোখে,
সন্ন্যাসিনী সে ভগবতী তবু সাক্ষাৎ রাজরাণী—
রূপেতে লক্ষ্মী মঙ্গলময়ী বরাভয় দুই করে ;
অযাচিত দানে লোভী সন্তানে পালন করিছে মাতা।
যোগশাস্ত্র ও ভগবৎগীতা গুরু ভবানীর কাছে
শিখিয়া সকল কর্ম্মের ফল শ্রীকৃষ্ণে সঁপিয়াছে।

নিবিড় তিমিরে নির্ব্বাণমুখ আলোকবিন্দুবৎ।
ক্রমে ক্রমে সেই মহা-তেজোময়ী বিলীন সলিলতলে ;
কাঁদে সন্তান শ্মশান-শয়নে তবু না উঠিল মাতা,
কবে উঠিবেন ব্যাকুল হৃদয়ে প্রতীক্ষা তার করি।

*   *   *

সম্মুখে মোর প্রাচীর গাত্রে ঝুলে আলেখ্যখানি—
আলেখ্য নয়, সুতীক্ষ্ণ অসি ঝলিছে নয়ন আগে।
নিবিড় তিমির এ অসি-ফলকে খণ্ড খণ্ড করি
হয়তো একদা ঘোর অরণ্যে মিলিবে চলার পথ।

বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রনীতি

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি যখন গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে দৃঢ় হইতেছিল, সে সময় কেবল ইংরেজের শৌর্য্যবীর্য্য ও বুদ্ধিবলেই কার্য্য উদ্ধার হয় নাই। বলা বাহুল্য, ইংরেজ শাসকেরা বহুপরিমাণে আমাদের দেশের লোকদের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ভারতবাসী যে শুধু ইংরেজের হইয়া লড়াই করিয়াছিল তাহা নহে, যে আমলাতন্ত্রের ফলে ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি এদেশে দৃঢ় হইয়াছিল, সেই আমলাতন্ত্রের মধ্যে অনেকাংশ, এমন কি অধিকাংশই ভারতবাসী ছিল বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। আর এই ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাংলা দেশ হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী 'আমলা' সরবরাহ হইয়াছে। বাঙালী যুবক নূতন পশ্চিমী শিক্ষার আলোক পাইয়া দলে দলে আমলা-তন্ত্রে যোগ দিয়াছে, হাজার রকম চাকরি দ্বারা ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি এদেশে সুদৃঢ় করিয়াছে।

কিন্তু সেকালে যেমন এই বাঙালী যুবকদের উপরে ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি দৃঢ় করিতে সহায়তা করিবার ভার পড়িয়াছিল, ভাগ্যের পরিহাসে ঠিক সেই চাকুরিয়ারাই ইংরেজ রাজত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলনের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র, দীনবন্ধু প্রভৃতি চাকুরিয়াদের কথা মনে করিলেই এ কথার সত্যতা বুঝিতে পারা যাইবে।

ইহার একটা সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া বোধ হয় অসম্ভব নয়। সেকালে এই চাকরি বাঙালীদের পক্ষে যেমন লোভনীয় ছিল, তেমনই যাঁহারা ইহার যথার্থ আস্বাদগ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা হয়তো ইহার অন্তঃসারশূন্যতাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যে জিনিসের দূর হইতে যথেষ্ট চাকচিক্য থাকে, নিকট হইতে তাহার গিল্টি ধরা পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী।

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার মধ্যে তীব্রতার ইহা একটা কারণ হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু কারণ যাহাই হউক না কেন, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার মধ্যে তীব্রতার যথেষ্ট প্রাচুর্য্য রহিয়াছে—একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তিনি যুক্তি-তর্কে, গল্পে উপন্যাসে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে যাহা করিয়া গিয়াছেন বাংলা রাজনীতিক সাহিত্যে তাহার তুলনা এখন পর্য্যন্ত পাওয়া সহজ নয়।

হরবল্লভ রায়ের বাড়িতে খিড়কি-পুকুরঘাটে
ঘোমটায় মুখ ঈষৎ ঢাকিয়া যত্নে বাসন মাজিছে নূতন বধূ—
সাগর-বউয়ের সাথে সাথে মোরা নূতন বউয়ের দেখিনু নূতন রূপ।
রূপার সিংহাসনে যে বসেছে হীরার মুকুট শিরে,
গীতার ধর্ম্ম শিখিয়া যে জন নিষ্কাম রাজরাণী,
দাসীর মতন করে সেই গৃহকাজ ;
নারীর ধর্ম্ম রাজত্ব করা নয়—
কঠিনতর যে ধর্ম্ম তাহার পালন ঘরের কাজ,
কোন যোগ চেয়ে সহজ নহে এ যোগ।
নিরক্ষরের স্বার্থপরের অনভিজ্ঞের ব্যবহার প্রতিদিন,
সরল সেবায় সকলেরে সুখী করা।
কেহ জানিল না জ্ঞানের বহ্নি জ্বলে অন্তরমাঝে,
নিষ্কাম তবু সুকর্ম্মপরায়ণা,
বাহিরে ভিতরে আসল সন্ন্যাসিনী।
ভবানী ঠাকুর হাতে গড়িয়াছে শাণিত কুঠারসম
সহজে ছিন্ন করিতে সে পারে অতীব জটিল গ্রন্থি সংসারের।
কেহ জানিল না ছেদন করিল কি যে,
কেহ জানিল না আছে কি না আছে অক্ষর-পরিচয়।
সে দেবী-নিবাসে প্রবেশ করিনু পড়িতে পড়িতে এ 'দেবী-চৌধুরাণী'—
শুনিলাম বাণী—নিরাশ জনের পরমাশ্বাস-বাণী,
'দুষ্কৃতে নাশ সাধু সুজনের পরিত্রাণের লাগি
স্থাপিতে ধর্ম্ম সংসারে তাঁর সম্ভব যুগে যুগে।'

* * *

সপ্তমী পূজা—কমলাকান্ত বসেছে আফিম খেয়ে,
তার সাথে সাথে দেখিলাম আমি চলিছে কালের স্রোত,
দিগন্ত ব্যেপে চলিছে প্রবল বেগে—

ভাসিয়া চলেছি তারি মাঝখানে ক্ষুদ্র ভেলায় চড়ি,
ভাসিয়া চলেছি অসীম অকূল ভীষণ অন্ধকারে ;
বাত্যাক্ষুব্ধ তরঙ্গ নীচে—উর্দ্ধে তারকা জ্বলে—
কভু উজ্জ্বল, কভু ম্লান, কভু নিভিয়া নিভিয়া যায়।
মনে হ'ল, আমি একা নিতান্ত অভাগা মাতৃহীন,
কালসমুদ্রে ভাসিয়া চলেছি সে মাতৃ-সন্ধানে—
কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি জননী বঙ্গভূমি !
চকিতে দেখিনু দূরে বহুদূরে প্রভাত-অরুণ-আভা,
স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল যেন।
বায়ু-তরঙ্গ-তাড়িত সলিলে স্বর্ণকান্তি প্রতিমা সপ্তমীর
হাসিছে ভাসিছে ছড়াইছে আলো, দিঙ্মণ্ডল আলোয় আলোকময়—
সভয়ে চিনিনু এই তো আমার জননী জন্মভূমি ;
রত্নাভরণ-ভূষিতা জননী মৃণ্ময়ী মা আমার—
দশভুজ তাঁর প্রসারিত দশ দিকে।
পদতলে তাঁর পীড়িত শত্রু—শত্রুবিমর্দ্দিনী,
ডাহিনে ভাগ্যরূপিণী লক্ষ্মী—বামে বাণী বাগ্‌দেবী,
সমুখে বসিয়া ত্রিভুবনজয়ী কুমার কার্ত্তিকেয়,
সিদ্ধিপ্রদাতা গণেশ অন্য পাশে।
সুবর্ণময়ী বঙ্গ-প্রতিমা ভাসে কালস্রোতোজলে
তাঁহার চরণে দিনু পুষ্পাঞ্জলি।

দেখিতে দেখিতে কালসমুদ্রে ডুবিল প্রতিমাখানি—
মনের মানসে বিধি আজো মিলিল না।
মনুষ্যত্ব মেলে নি মোদের ঐক্য-বিদ্যা-গৌরব-ঈপ্সিত ;
সুখদুঃখের সীমা-রেখা পার, নষ্ট সুখের স্মৃতি,
চাহিবার শুধু পড়িয়া রয়েছে বিরাট শ্মশানভূমি—
কুলু কুলু নদী বহিছে গঙ্গা সে মহাশ্মশান বেড়ি ;
একদা নিশীথে নীরবে জননী লজ্জায় মুখ ঢাকি
শঙ্কিত পায়ে নামিলেন জলে বাহিয়া সোপানাবলী,

প্রত্যেক বিপ্লবের মূলে থাকে বহুকালকার অশান্তি, পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ, বর্ত্তমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। রাজপুরুষ বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্তে বিদেশী প্রভুদের এদেশী জনসাধারণের উপর অবজ্ঞা ও তাহার সঙ্গে আমাদের দেশের লোকের বৈদেশিক অনুকরণস্পৃহা ও পরপদাবলেহনের প্রবৃত্তি যে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিল, তাহা তাঁহার লেখার মধ্যে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত আছে। তাঁহার প্রবন্ধগুলির কথা আগে বলিব না, তিনি তাঁহার বিদ্রূপের মধ্যে বৈদেশিক প্রভুদের উপর যে দারুণ কশাঘাত করিয়াছেন, তাহা তরবারির ধারের মত তীক্ষ্ণ ও তরবারির মতই তাহার দীপ্তি। কমলাকান্ত আফিম খাইয়া বলিতেছে, "ইহার পর দেখিলাম ইহাদিগের সম্মুখেই একস্‌পেরিমেণ্টাল সায়েন্সের দোকান। কতকগুলি সাহেব দোকানদার ঝুনা নারিকেল, বাদাম, পেস্তা, সুপারি প্রভৃতি ফল বিক্রয় করিতেছেন। ঘরের উপর বড় বড় পিতলের অক্ষরে লেখা আছে:—Messrs. Brown Jones and Robinson—Nut-suppliers. Establised 1757 on the battle of Plassey. Messrs. Brown Jones and Robinson offer to the Indian public a large assortment of nuts physical, metaphysical, logical, illogical and sufficient to break the jaws and dislocate the teeth of all Indian youths who stand in the need of having their dental superfluities curtailed. দোকানদার ডাকিতেছেন—আয় কালা বালক—এক্‌স্‌পেরিমেণ্টাল সায়েন্সের ঘুসি খাবি আয়। দেখ ১ নম্বর এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট ঘুসি; ইহাতে দাঁত উপড়ে, মাথা ফাটে এবং হাত ভাঙ্গে। আমরা এ সকল এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট বিনামূল্যে দেখাইয়া থাকি।" ইহার প্রতি ছত্রে যে তীব্র জ্বালা ফুটিয়াছে, বিদ্রূপের তিক্তরস ও আপাতঃ গাম্ভীর্য্যের আবরণ তাহার জ্বালা শতগুণে বাড়াইয়া দিয়াছে। ভবানী পাঠকের মুখে তিনি স্পষ্টই বলাইতেছেন—'মুসলমান লোপ পাইয়াছে, ইংরেজ সম্প্রতি ঢুকিতেছে—তাহারা রাজ্যশাসন করিতে জানেও না, করেও না।" আর এই এদেশী তথাকথিত সাহেবদের আকাশস্পর্শী ঔদ্ধত্যের উপর বঙ্কিমচন্দ্র সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছেন তাঁহার লোকরহস্যের বিখ্যাত Bransonism নিবন্ধে। বিস্তৃত উদ্ধৃতির প্রয়োজন নাই, কিন্তু হাকিমের প্রশ্নের উত্তরে সাহেবের কালরংয়ের কৈফিয়ৎ "মুই কোয়েলার কাম করেছিল" এবং তাহার পর পিতার নাম জিজ্ঞাসা করায় "হামার বাপ বড়া আদমী ছেলো, লেকেন নামটা এখন মনে পড়ছে না" ও শেষে সে নাম গোবর্দ্ধন সাহেব বলায় সাহেবের জবাব "আমার বাপ বড় লোকের সাদি দিত (বিবাহের বাজনায় জয়ঢাক ঘাড়ে করিত)" প্রভৃতি উক্তির যথার্থতা হয়তো বর্ত্তমানেও দুর্লভ নয়।

একথা অবশ্যস্বীকার্য্য যে বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশের অন্ধভক্ত ও বিদেশের অন্ধশত্রু ছিলেন না। তাঁহার তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির সম্মুখে স্বদেশের দোষ ও বিদেশের গুণ চোখ এড়াইতে পারে নাই।

এবং যেখানেই এইরূপ কিছু নজরে পড়িয়াছে তিনি মুক্তকণ্ঠে তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। প্রমাণস্বরূপ 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' নামক প্রবন্ধের উল্লেখ করিব। তাহাতে তিনি স্পষ্ট বলিতেছেন "আধুনিক ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের মঙ্গলের জন্য যেমন ভারতবর্ষের মঙ্গল কখন কখন নষ্ট হয়, তেমনি প্রাচীন ভারতে রাজার আত্মসুখের জন্য রাজ্যের মঙ্গল নষ্ট হইত…আবার ইংরেজের রাজ্যে যেমন ইংরেজ দেশী লোক কর্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে না প্রাচীন ভারতেও সেইরূপ ব্রাহ্মণ শূদ্র কর্তৃক দণ্ডিত হইতে পারিত না…ইংরেজের রাজ্যে রাজপ্রসাদ প্রায় ইংরেজেরই প্রাপ্য, কিন্তু কিয়ৎপরিমাণে দেশীয়েরাও উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত—ব্রাহ্মণ রাজ্যে শূদ্রদিগের তত ঘটিত কিনা সন্দেহ।" এবং প্রবন্ধের শেষে মতপ্রকাশ করিয়াছেন "আধুনিক ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর লোকের অবনতি ঘটিয়াছে, শূদ্র অর্থাৎ সাধারণ প্রজার একটু উন্নতি ঘটিয়াছে।" সেইজন্য একথা নির্ভয়ে বলিতে পারা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিষয়ে পক্ষপাতিত্ব ছিল না। কিন্তু তাঁহার প্রতিদিনকার কাজে তিনি যাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন চারিপাশে দেখিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে তাঁহার তীব্র অভিযান। এবং এই অভিযান যে শুধু পূর্ব্বোদ্ধৃত অপমান ও অবজ্ঞার বিরূদ্ধে তাহা নহে, এ অভিযান বৈদেশিক প্রভুত্বে আমাদের সংস্কৃতির বিকৃতি, ভাষার বিকৃতি, ইতিহাসের বিকৃতি সব কিছুর বিরুদ্ধে। 'রামায়ণের সমালোচনা ঃ কোন বিলাতী সমালোচক প্রণীত' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এই সংস্কৃতির বিকৃতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। সমালোচক বলিতেছেন—

"আমি রামায়ণ গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। অনেক সময় রচনা প্রায় নিম্নশ্রেণী ইউরোপীয় কবিদের তুল্য। হিন্দু কবির পক্ষে ইহা সামান্য গৌরবের বিষয় নহে।…রামায়ণে…বুদ্ধিহীনতার যে দোষ কবি তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।…জ্যেষ্ঠপুত্র ভারতবর্ষীয়দিগের স্বভাবসিদ্ধ আলস্যবশতঃ আপন স্বত্বাধিকার বজায় রাখিবার কোনো যত্ন না করিয়া বুড়া বাপের কথায় বনে গেল। ইহার সহিত মহাতেজস্বী তুর্ক বংশীয় ঔরঙ্গজেবের তুলনা কর। মুসলমান কেন এতকাল হিন্দুর উপর রাজত্ব করিয়াছে বুঝিতে পারিবে।…আর একটি অসভ্য মূর্খ ভরত। আপন হাতে রাজত্ব লইয়া ফিরাইয়া দিল। ফলতঃ রামায়ণ অকর্ম্মা লোকের ইতিহাসে পূর্ণ।

…রামায়ণ নামে একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ আমি দেখিয়াছি। বাল্মীকি রামায়ণ কৃত্তিবাস হইতে সঙ্কলন করিয়াছেন তাহা মীমাংসা করা সহজ নহে কিন্তু রামায়ণ নামটীই এ বিষয়ের এক প্রমাণ। "রামায়ণ" শব্দের সংস্কৃত কোন অর্থ হয় না, কিন্তু বাঙ্গালার সদর্থ হয়। বোধ হয় "রামায়ণ" শব্দটী "রামা যবন" শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। কেবল "ব"কার লুপ্ত হইয়াছে। রামা যবন বা রামা মুসলমান নামক কোন ব্যক্তির চরিত্র অবলম্বন করিয়া

কৃত্তিবাস প্রথম ইহা রচনা করিয়া থাকিবেন। পরে কেহ সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া বল্মীক মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। পরে গ্রন্থ বল্মীক মধ্যে প্রাপ্ত হওয়ায় বাল্মীকি নামে খ্যাত হইয়াছে।"

এবং সেই সঙ্গে "কোন 'স্পেশিয়ালের' পত্রে" "দেখিলাম অনেক বাঙ্গালী ম্যানচেষ্টারের তন্তুপ্রসূত বস্ত্র পরিধান করে, অতএব স্পষ্টই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে ভারতবর্ষ ম্যানচেষ্টারের সংস্রবে আসিবার পূর্ব্বে বঙ্গদেশের লোক উলঙ্গ থাকিত" প্রভৃতিতে বৈদেশিক তথা-কথিত পণ্ডিত ও তাঁহাদের বিকৃত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হইয়াছিল তাহা আমাদের জাতীয় কৃষ্টির ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। 'ভারতবর্ষের কলঙ্ক' 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' প্রভৃতি প্রবন্ধে বাঙ্গালার ও ভারতের মিথ্যা ইতিহাস রচনার চেষ্টার বিরুদ্ধে যে জলন্ত প্রতিবাদ, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক অস্ত্র এই তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ কেবলমাত্র বিদেশীয়দের উপরই পড়ে নাই, বিদেশীর অনুকরণপ্রিয় সেকেলে এদেশীয়দের মর্ম্মেও যথেষ্ট আঘাত করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র সেকেলে বাবুদের কথা বলিতেছেন—"যাঁহার ইষ্টদেবতা ইংরাজ, গুরু ব্রাহ্মধর্ম্মবেত্তা, বেদ দেশী সংবাদপত্র এবং তীর্থ ন্যাশনেল থিয়েটার তিনিই বাবু...যাঁহার যত্ন কেবল পরিচ্ছদে, তৎপরতা কেবল উমেদারীতে, রাগ কেবল সদ্‌গ্রন্থের উপর, নিঃসন্দেহ তিনিই বাবু; যাঁহাদিগের দশেন্দ্রিয় প্রকৃতিস্থ, অতএব অপরিশুদ্ধ, যাঁহাদের কেবল রসনেন্দ্রিয় পরজাতিনিষ্ঠীবনে পবিত্র, তাঁহারাই বাবু; যাঁহাদিগের চরণ মাংসাস্থিবিহীন শুষ্ককাষ্ঠের ন্যায় হইলেও পলায়নে সক্ষম, হস্ত দুর্ব্বল হইলেও লেখনীধারণে এবং বেতনগ্রহণে সুপটু, চর্ম্ম কোমল হইলেও সাগরপারনির্ম্মিত দ্রব্য বিশেষের প্রহার-সহিষ্ণু,...তাঁহারাই বাবু।...বিষ্ণুর ন্যায় ইঁহাদিগেরও দশ অবতার—যথা কেরাণী, মাষ্টর, ব্রাহ্ম, মুৎসুদ্দী, ডাক্তার, উকীল, হাকিম, জমিদার, সংবাদপত্র-সম্পাদক এবং নিষ্কর্ম্মা। বিষ্ণুর ন্যায় ইঁহারা সকল অবতারেই অমিতবল পরাক্রম অসুরগণকে বধ করিবেন। কেরাণী অবতারে বধ্য অসুর দপ্তরী; মাষ্টার অবতারে বধ্য ছাত্র; ষ্টেশন মাষ্টার অবতারে বধ্য টিকেটহীন পথিক, ব্রাহ্মাবতারে বধ্য চালকলাপ্রত্যাশী পুরোহিত, মুৎসুদ্দী অবতারে বধ্য বণিক ইংরাজ; ডাক্তার অবতারে বধ্য রোগী; উকীল অবতারে বধ্য মোয়াক্কেল; হাকিম অবতারে বধ্য বিচারার্থী; জমীদার অবতারে বধ্য প্রজা; সম্পাদক অবতারে বধ্য ভদ্রলোক এবং নিষ্কর্ম্মাবতারে বধ্য পুষ্করিণীর মৎস্য।"

বাংলার সেযুগে অন্ধ অনুকরণের ফলে যে অবনতি দেখা দিয়াছিল সেই অবনতি ও আত্মাবমাননার সম্বন্ধে এই তীব্র কশাঘাতে লোককে সচেতন করিয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। নিজের দেশের যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু অনুকরণীয় তাহার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া ধার করা বেশভূষার চরম অপমান সম্বন্ধে দেশবাসী তখন সজাগ ছিল না; বাংলার

জাতীয়তার সেই নবীন উষায় বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম তাঁহার তীব্র খরসন্ধানী আলোর ছটায় আত্মবিস্মৃতির অন্ধতমঃ দূর করিয়াছিলেন বলিলে কোন অত্যুক্তি করা হইবে না। পর-প্রসাদকণিকার নির্লজ্জ লোভ যখন বাঙালীর মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র সে সময় সে সম্বন্ধে তাঁহার 'ইংরাজ স্তোত্রে' ইংরেজকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন "হে বরদ, আমাকে বর দাও। আমি শামলা মাথায় বাঁধিয়া তোমার পিছু পিছু বেড়াইব—তুমি আমাকে চাকুরি দাও। আমি তোমাকে প্রণাম করি। হে শুভঙ্কর! আমার শুভ কর। আমি তোমার খোষামোদ করিব, তোমার প্রিয় কথা কহিব, তোমার মন রাখা কাজ করিব—আমায় বড় কর—আমি তোমাকে প্রণাম করি। হে মানদ, আমায় টাইটল দাও, খেতাব দাও, খেলাত দাও—আমাকে তোমার প্রসাদ দাও—আমি তোমাকে প্রণাম করি।…হে অন্তর্য্যামিন্, আমি যাহা কিছু করি তোমাকে ভুলাইবার জন্য; তুমি দাতা বলিবে বলিয়া আমি দান করি, তুমি পরোপকারী বলিবে বলিয়া আমি পরোপকার করি।…হে ভগবন্, আমি অকিঞ্চন, আমি তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি আমাকে মনে রাখিও।" আর বাঙালী যখন সেই সর্ব্বনাশকর আত্মবিস্মৃতির ফলে নিজের ভাষা, নিজের সংস্কৃতি—এক কথায় যাহা কিছু নিজস্ব ছিল তাহা বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তখন তাঁহার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে লোককে সচেতন করিয়া দিয়াছিলেন। 'ইংরাজ স্তোত্রে' বাঙালী বলিতেছে "হে সৌম্য, যাহা তোমার অভিমত তাহাই আমি করিব। আমি বুট পাণ্টালুন পরিব, নাকে চসমা দিব, কাঁটা চামচে ধরিব, টেবিলে খাইব—তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে মিষ্টভাষিন্, আমি মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া তোমার ভাষা কহিব; বাবু নাম ঘুচাইয়া মিষ্টর লেখাইব, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।" আর সেই সঙ্গে তাঁহার 'লোকরহস্যে'র মধ্যে "বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর" নিবন্ধে উচ্চদরের উচ্চশিক্ষিত বাবু তাহার পত্নীকে বলিতেছেন, "ছাইভস্ম বাঙ্গালাগুলো পড় কেন? ওর চেয়ে না পড়া ভাল" প্রভৃতি উক্তি যে বাঙালী তাঁহার সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলা দেশকে, বাংলা ভাষাকে, বাঙালী জাতিকে কিছুমাত্র ভালবাসিয়াছেন, তাঁহার মনে চিরকাল জলজ্বল করিতে থাকিবে।

২

এইবার তাঁহার ব্যঙ্গবিদ্রূপ ছাড়িয়া তাঁহার প্রবন্ধগুলির আলোচনা প্রয়োজন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রত্যেক বিপ্লবের মূলে থাকে পুঞ্জীভূত অশান্তি, বর্ত্তমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; এবং আমরা আগেকার উদ্ধৃতিগুলিতে দেখিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে সেকালের সমাজব্যবস্থা ও

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কি তীব্র অসন্তোষ রহিয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বিচার্য্য, বঙ্কিমচন্দ্র কেন সেরূপ অসন্তোষ পোষণ করিতেন এবং তাঁহার কি কাম্য ছিল!

দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর কঠিন নহে। রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের কাম্য এক ছাড়া দুই হইতে পারে না এবং সে কাম্য স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা অর্থে যেমন বাহিরের অধিকার হইতে স্বাধীনতা, তেমনই দেশের মধ্যে মুষ্টিমেয় জনসংখ্যার হাত হইতে জনসাধারণের স্বাধীনতা। এবং এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার লেখনী চালনা করিয়াছেন। প্রথমে বহিঃস্বাধীনতার কথা আলোচনা করা যাক। 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা" শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এই বহিঃস্বাধীনতার স্বরূপ নির্ণয় করিতে যাইয়া বলিতেছেন, "শাসনকর্ত্তা ভিন্ন জাতীয় হইলেই রাজ্য পরতন্ত্র হইল না। পক্ষান্তরে, শাসনকর্ত্তা স্বজাতীয় হইলেই রাজ্য স্বতন্ত্র হয় না।" প্রথম উদাহরণ হ্যানোভার বংশীয় রাজাদের অধীনে ইংলণ্ড। দ্বিতীয় উদাহরণ ওয়াশিংটনের কৃত যুদ্ধের পূর্ব্বে আমেরিকার শাসনকর্ত্তৃগণ স্বজাতীয় ছিল। কিন্তু তাহারা স্বাধীন ছিল না। সুতরাং "দুইটি রাজ্যের একরাজা হইলে তাহার একটি পরতন্ত্র একটি স্বতন্ত্র। যে দেশে রাজা বাস করেন, সেইটি স্বতন্ত্র, যে দেশে বাস করেন না, সেইটি পরতন্ত্র।" এবং ভারতবর্ষ শুধু পরতন্ত্র নহে, কারণ প্রথম জর্জের সময় ইংলণ্ডে এইরূপ পরতন্ত্রতা ঘটিলেও পরাধীনতা ঘটে নাই—ভারতবর্ষ পরতন্ত্র এবং পরাধীন, কারণ "যেখানে দেশীয় প্রজা এবং রাজার স্বজাতীয় প্রজায় এরূপ তারতম্য, সেই দেশকে পরাধীন বলিব। সে রাজ্য পরজাতি পীড়নশূন্য, তাহা স্বাধীন।" এবং এইরূপ স্বাধীনতার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। "ভারত কলঙ্ক : ভারতবর্ষ পরাধীন কেন" নামে 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি বলিতেছেন, "স্বজাতীয়ের রাজ্যশাসন মঙ্গলকর বা সুখের আকর, পরজাতীয়ের রাজদণ্ড পীড়াদায়ক বা লাঘবের কারণ।" ভারতবর্ষ পরাধীন, তাহার কারণ "ভারতবর্ষীয়েরা স্বভাবতঃই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষারহিত। স্বদেশীয় স্বজাতীয় লোকে আমাদিগকে শাসিত করুক, পরজাতীয়দিগের শাসনাধীন হইব না, এরূপ অভিপ্রায় ভারতবর্ষীয়দিগের মনে আইসে না—তাঁহাদিগের বিবেচনা রাজা স্বজাতীয় হউক পরজাতীয় হউক, সুশাসন করিলে দুই সমান।" ভারতবর্ষ পরাধীন, কারণ "আমাদের হিন্দু সমাজের অনৈক্য, সমাজমধ্যে জাতিপ্রতিষ্ঠার অভাব ; পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গলমাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয় তাহাই করিব। অপিচ তাহাদের অমঙ্গলে আমাদের মঙ্গল হইতে পারে। হয় হউক, আমরা সে জন্য আত্মজাতির মঙ্গল সাধনে বিরত হইব না।" আর এই বহিঃস্বাধীনতা লাভের উপায় সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র

যাহা বলিয়াছেন সে সম্বন্ধে তাঁহার 'আনন্দমঠের' অগ্নিবাণী উদ্ধার করিব না, মাত্র 'কমলাকান্ত' হইতে কয়েক লাইন উদ্ধার করিয়াই এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। 'বাঙালীর মনুষ্যত্ব' নামে পরিচ্ছেদে ভ্রমর আসিয়া কমলাকান্তকে বলিতেছে—"বাঙালী হইয়া কে ঘ্যানঘ্যানানি ছাড়া? কোন বাঙালীর ঘ্যানঘ্যানানি ছাড়া অন্য ব্যবসা আছে?...কেহ বা মনে করেন ঘ্যানঘ্যানানির চোটে দেশ উদ্ধার করিবেন—সভাতলে ছেলে বুড়া জমা করিয়া ঘ্যানঘ্যান করিতে থাকেন।...তোমায় সত্য বলিতেছি কমলাকান্ত, তোমাদের জাতির ঘ্যানঘ্যানানি আর ভাল লাগে না। দেখ, আমি যে ক্ষুদ্র পতঙ্গ, আমিও শুধু ঘ্যানঘ্যান করি না—মধুসংগ্রহ করি আর হুল ফুটাই। তোমরা না জান মধু সংগ্রহ করিতে না জান হুল ফুটাইতে, কেবল ঘ্যানঘ্যান কর।...তোমাদের রসনা অপেক্ষা আমাদের হুল শ্রেষ্ঠ—বাক্যবাণে মানুষ মরে না, আমাদের হুলের ভয়ে জীবলোক সদা সশঙ্কিত। স্বর্গে ইন্দ্রের বজ্র, মর্ত্ত্যে ইংরেজের কামান, আকাশমার্গে আমাদের হুল।...মধু সংগ্রহ করিতে শেখ, হুল ফুটাইতে শেখ—তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে।" ইহার উপর টীকা নিষ্প্রয়োজন।

এইবার বহিঃস্বাধীনতার কথা ছাড়িয়া অন্তঃস্বাধীনতার কথায় আসা যাক। দেখা যায় যে, প্রত্যেক দেশে সাধারণতঃ জনসাধারণের উপর তিন শ্রেণীর লোক আধিপত্য করে অর্থাৎ এ যুগের ভাষায় বলিতে গেলে, পুঁজিবাদী সাধারণতঃ তিন প্রকারের। এক, উচ্চজাতি কর্ত্তৃক নিম্নজাতির পীড়ন; দুই, জমিদার কর্ত্তৃক প্রজা পীড়ন; এবং তিন, ধনী কর্ত্তৃক শ্রমিক পীড়ন। ইহার মধ্যে পশ্চিমী ভূখণ্ডে যাহারা উচ্চজাতি তাহারা অনেক সময় নিম্ন জাতির উপরে পীড়ন করে, ইহা সত্য কথা; কিন্তু সে পীড়ন মুখ্যতঃ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কিছু পরিমাণে সামাজিক। কিন্তু আমাদের দেশে এই পীড়ন মুখ্যতঃ সামাজিক, এ পীড়ন এক ধর্ম্ম কর্ত্তৃক অপর ধর্ম্মের পীড়ন, এক বর্ণ কর্ত্তৃক অপর বর্ণের পীড়ন। এবং তৃতীয়টি সম্বন্ধে সকলেই এক মত যে পশ্চিমী দেশগুলির মত এদেশে ধনিক (industrial bourgeoisie) ও শ্রমিক সমস্যা প্রথম দুইটি সমস্যার মত প্রবল নহে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'সাম্য' ও 'বঙ্গদেশের কৃষক' নামক প্রবন্ধ দুইটিতে ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। 'সাম্যে'র প্রথম পরিচ্ছেদে তিনি বলিতেছেন, "বড় লোক ছোট লোক এ প্রভেদ কিসে? রাম বড়লোক, যদু ছোটলোক কিসে? যদু চুরি করিতে জানে না, বঞ্চনা করিতে জানে না, পরের সর্ব্বস্ব শঠতা করিয়া গ্রহণ করিতে জানে না, সুতরাং যদু ছোট লোক; রাম চুরি করিয়া, বঞ্চনা করিয়া, শঠতা করিয়া ধন সঞ্চয় করিয়াছে, সুতরাং রাম বড় লোক। অথবা রাম নিজে নিরীহ ভাল মানুষ, কিন্তু তাহার প্রপিতামহ চৌর্য্য বঞ্চনাদিতে সুদক্ষ ছিলেন; রাম জুয়াচোরের প্রপৌত্র সুতরাং সে বড় লোক। যদুর পিতামহ আপনি আনিয়া আপনার

খাইয়াছে—সে ছোট লোক।" বাস্তবিক বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার মধ্যে এই অর্থ নৈতিক বৈষম্যের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, সমসাময়িক লেখকদিগের মধ্যে কেহই সেরূপ করেন নাই। তিনি এ প্রবন্ধে বলিতেছেন, "বড় লোক আর এক প্রকারের আছে। গোপাল ঠাকুর কন্যাভারগ্রস্ত, কন্যাভারগ্রস্ত বলিয়া দুইচারি পয়সা ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে—এও বড় লোক, কেন না গোপাল ব্রাহ্মণজাতি।" "দেশী বিলাতীর মধ্যে সেইরূপ আর একটি বৈষম্য। স্ত্রীপুরুষে বৈষম্য আর একটি বৈষম্য···কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অর্থগত বৈষম্য গুরুতর।" এবং এই অর্থগত বৈষম্যের কথা আলোচনা করিতে গিয়া তিনি 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে বলিতেছেন "আমাদিগের এই প্রস্তাব শ্রমজীবী প্রজা মাত্র সম্বন্ধে অভিপ্রেত বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু ভারতীয় শ্রমজীবীর মধ্যে কৃষিজীবী এত অধিক যে অন্য শ্রমজীবীর অস্তিত্ব এ সকল কালে স্মরণ রাখা না রাখা সমান।"

পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র ব্যঙ্গবিদ্রূপে যুক্তিতর্কে গল্পে উপন্যাসে কিরূপে ভারতবর্ষের পরাধীনতার প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার যে লেখনী তাঁহার প্রবন্ধে, তাঁহার উপন্যাসে, তাঁহার গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের চিত্রে বর্ণ বৈষম্যের প্রতিবাদে নিযুক্ত হইয়াছিল, সেই লেখনীই আবার এই বাংলার কৃষকদের জন্য সেকালের সমাজব্যবস্থা ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে আঘাত করিয়াছিল। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"দেশের উৎপন্ন ধন দুই ভাগে বিভক্ত হয়—এক ভাগ শ্রমোপজীবীর, এক ভাগ বুদ্ধ্যোপজীবীর। প্রথম ভাগ মজুরের 'বেতন', দ্বিতীয় ভাগ 'মুনাফা'। শ্রমোপজীবীরা সংখ্যায় যতই হোক না কেন উৎপন্ন ধনের যে অংশটি বেতন, সেইটিই তাহাদের মধ্যে বিভক্ত হইবে, মুনাফার মধ্য হইতে তাহারা এক পয়সা পাইবে না।" এই জন্য তিনি বলিয়াছেন, "যার ধন তার ধন নয়। যাহার মাথার কাল ঘাম ছুটিয়া ফসল জন্মে লাভের ভাগে সে কেহ হইল না।" তিনি দেখাইয়াছেন—এ ধনের কিছু অংশ রাজভাণ্ডারে যায়, বহু অংশ ভূস্বামীর হস্তে যায় এবং বাকী অংশ অন্যান্য পাওনাদারের নিকট যায়। সেই জন্য দেশের মঙ্গল হইতেছে বটে কিন্তু কাহার এত মঙ্গল? তিনি বলিয়াছেন, "বল দেখি চশমা নাকে বাবু! ইহাদের [চাষীদের] কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখা পড়া শিখিয়া ইহাদের কি মঙ্গল সাধিয়াছ? আর তুমি ইংরেজ বাহাদুর—তুমি বল দেখি যে তোমা হইতে এই হাসিম শেখ, রামা কৈবর্ত্তের কি উপকার হইয়াছে? আমি বলি অণুমাত্র না, কণামাত্র না। দেশের মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন?" তাঁহার প্রতি ছত্রে কৃষকদিগের জন্য এই দরদ, তাহাদের দুঃখে এই যে জ্বালা ফুটিয়া উঠিয়াছে, রাজনৈতিক সাহিত্যে, গল্পে উপন্যাসে ইহার তুলনা পাওয়া আজও সহজ নয়। এবং এই চিন্তাধারা যে আমাদের আধুনিকতম থিওরি হইতে কিছুমাত্র পিছনে নহে, তাহা

যাঁহারা রাজনীতির অতি সাধারণ মূলসূত্র লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাও বুঝিতে পারিবেন।

৩

পরিশেষে কয়েকটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বর্ত্তমান জগতে দ্রুত প্রগতির ঢেউ যেরূপ দেখা দিয়াছে, তাহাতে দশবৎসরের পুরাতন লেখকগণ বহুস্থানে বাতিল হইয়া গিয়াছেন, একশত বছর তো দূরের কথা! এবং ঠিক এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-রচনার বিরুদ্ধে এ যুগে অভিযান স্থরু হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক গুণাগুণ সম্বন্ধে বর্ত্তমান গ্রন্থে অন্যান্য লেখকেরা আলোচনা করিয়াছেন, সে কথা এখানে বিচার্য্য নহে। কিন্তু এ যুগে রাজনৈতিক বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধেও অভিযান স্থরু হইয়াছে। অবশ্য এ কথা সত্য যে, ১৮৩৮ সাল এবং ১৯৩৮ সাল এক নহে, এবং তখনকার রাজনৈতিক অবস্থা, তখনকার অভাব অভিযোগ, ও তখনকার রাজনৈতিক কৌশল এখনকার মত ছিল না। সেকালের রাজনীতিতে, কি ভারতবর্ষে, কি পশ্চিমে, অর্থনীতির সঙ্গে সমাজ-নীতি বহু পরিমাণে জড়িত ছিল এবং সেই জন্য সে যুগে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক অভাবের ফলেই রাজনীতি নির্দ্ধারিত হইত না। কিন্তু কালের যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমী ভূখণ্ডে সমাজ (যে অর্থে আমরা হিন্দু সমাজ, বৌদ্ধ সমাজ প্রভৃতি কথা ব্যবহার করি) ও ধর্ম্ম, অর্থনীতির নিকট হইতে বহু পরিমাণে সরিয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমানের রাজনীতির মধ্যে ধর্ম্ম বা বর্ণের স্থান পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প। ইহা ছাড়া গত শতাব্দীতে যেখানে স্বদেশপ্রেমই রাজনীতির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগণিত ছিল, বর্ত্তমানে সেখানে সব সময়ে তাহা নাই। আজকাল বহু ক্ষেত্রে আমরা দেশের গণ্ডী কাটাইয়া উঠিয়া জগৎজোড়া সমস্যার কথা ভাবিতে শিখিয়াছি। এ কথা স্বীকার করিতে হইবে বঙ্কিমচন্দ্র হয়তো সব সময়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা পৃথক্ রাখেন নাই, যদিও তিনি স্পষ্টতঃই বলিয়াছিলেন, অর্থগত বৈষম্যই সকল বৈষম্য অপেক্ষা গুরুতর, এবং বঙ্কিমচন্দ্র হয়তো স্বদেশপ্রেমের গণ্ডী ছাড়িয়া এই বিশ্বপ্রেমের গণ্ডীতে উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে এইরূপ সমালোচনা অন্ততঃ আমাদের পক্ষে নিতান্তই অশোভন। কারণ এখনও যে দেশের বুকে "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা" ও "তপশীলভুক্ত জাতির" কলঙ্কময় ছাপ রহিয়াছে সে দেশে একশত বৎসর আগে বঙ্কিমচন্দ্র সব সময়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা আলাদা রাখেন নাই বলা এ কথা নিরর্থক। এবং আমরা যেখানে এই ভারতবর্ষের কোটি কোটি নিরাশ্রয়ের অন্নবস্ত্রের সংস্থান এখনও করিয়া উঠিতে পারি নাই, সেখানে আমাদের পক্ষে বিশ্বের শ্রমিকদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করার কথা হয় তো উপহাসের মতই শোনাইবে।

আর সেই একশত বৎসর আগে বঙ্কিমচন্দ্রের যে তীব্র তিরস্কার—যে স্বাধীন ভারতের গৌরবময় চিত্র আমরা পাই, তাঁহার যে অগ্নিবাণীতে আমাদের শিরায় শিরায় রক্ত উচ্ছলিত হইয়া উঠে, তাহার সমতুল্য জিনিষ আমরা কয়টি পাইয়াছি? তাঁহার প্রতি পৃষ্ঠায় আমাদের এই দেশের আকাশ বাতাস, নদী, জল প্রত্যেক ধূলিকণার প্রতি যে সর্ব্বস্বত্যাগী টানের চিহ্ন পাই, সেই আপনহারা ভালবাসার যথাযথ সম্মান না করিয়া শুধু সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের কথা আলোচনা করিলে বোধ হয় তাঁহার প্রকৃত সম্মান করা হইবে না।

LETTERS ON HINDUISM

LETTERS ON HINDUISM

LETTER I

INTRODUCTORY

MY DEAR J...,

I have undertaken to put you in possession of my views regarding Hinduism in a number of letters, which I promise at the outset, shall be as few as the subject admits. The necessity that there exists of bringing the same views before others of my educated countrymen has compelled me to travel beyond the limits to which the controversy between you and me would have restricted them, and I frankly admit at once that I write with a view to future publication which will explain much that would have been otherwise unintelligible to you. The same necessity, or at least an ambition on my part of obtaining a hearing from the educated portion of my countrymen, has induced me to write in a language which is neither your vernacular nor mine. We may laugh at but we can not ignore, the lofty contempt with which a large section of my educated countrymen regard their own vernacular. Conscious that no amount of eloquence or sound argument on my part will enable me to attain to the honor of being read by any considerable numbers of those whom, along with you, I intend to address,* if I made the unfortunate choice of my own vernacular as the medium of communication, I discard it in favour of what is, in the eyes of a subject race, the loftiest and holiest of human languages,

* A Bengali gentleman of high attainments and a European representation once made enquiries of me regarding a certain vernacular publication. He felt that he had compromised his dignity by stooping to enquire about a vernacular publication, and he hastened to explain that his interest proceeded from the desire which his wife, to whom all literature but the vernacular was sealed treasure, felt to become acquainted with the publication in question.

the language of their rulers. To me who have spent the best years of my life in addressing my countrymen in my own vernacular, this seems like the desertion of a beloved parent by one who had betrayed a dutiful child and I feel that to you, who has been to me like a brother in this attachment to our own mother-tongue, I owe an explanation for this apparent desertion.

Hinduism, too, is not the exclusive porperty of us Bengalis, but belongs to all Hindus in India. Sanskrit has ceased to be to India what Latin was to Europe during the middle ages and any one who wishes to address all Hindus must of necessity write in English. I am not at all ambitious of finding European readers, when, as I expect to do, I come to publish these letters, but I shall be happy if any European friends of this country can be found to bestow on the matters, contained in these letters, such attention as to them they may seem to deserve.

Letters
on
Kindaism[illegible]

Letter I Introductory

My dear J*******

I have undertaken to put you in possession of my views regarding Kindaism in a number of letters, which I promise at the outset, shall be as few as ~~possible~~ the subject admits. The necessity that there exists of bringing the same views before the others of my educated countrymen has compelled me to travel beyond the ~~original~~ ~~scope~~ limits to which the controversy between you and me would have restricted them,

and I frankly admit ~~that~~ ~~I~~ at once that I write with a view to future publication which will explain much that would have been otherwise unintelligible. ~~Upon~~ The same necessity, or at least an ambition on my part, of obtaining a hearing from the educated portion of my country

LETTER II

What is Hinduism?

I have sought for an answer to this question from many, but have received none. I have read and heard much in condemnation of Hinduism, condemnation as strong as language can make it. Christians and their uneducated Hindu disciples unite in denouncing it as the most monstrous system of organised human depravity which has ever been called into existence, hard-hearted politicians and lachrymose philanthropists are alike convinced that to it alone is due the improvement and degradation of India. Learned philologists in Europe and half-educated missionaries in India combine in prescribing its immediate annihiliation as the only possible remedy for all the evils from which that unhappy country is suffering, serenely unconscious that there are vast populations in India who are not Hindus, who are neither polytheists nor idolators, but who are even in a more unhappy condition than the Hindus.* In the writings and harangues of those who denounce so earnestly the evils of Hinduism I have sought for, but never obtained, any indication that the writer or speaker's notion of Hinduism went further than that it was a superstitious and polytheistic religion, the very worst of all superstitious and polytheistic religions, and that it is the duty of pious and benevolent Christians and of educated and progressive natives to misunderstand it, to misrepresent it and to revile it. If ever I entertained any doubts that it is possible to be exceedingly eloquent on subjects of which our own conceptions are dim and shadowy, the critics of Hinduism have certainly dispelled them.

Not that I have never received any reply to my question "What is Hinduism?" I asked an excited controversialist, "What is it

* The Mussalmans of Bengal for instance a population equal to that of......

that you denounce so furiously?" "Hinduism! why surely the religion of the Hindus," was the contemptuous reply. "Agreed," said I, "and pray what is a Hindu?" "Why—ah yes—a Hindu is a native of Hindusthan,"—he was going to say, but as just then he happened to cast his look on the flowing beard of his Mussalman neighbour, Gholum Hyder Khan, he was obliged to alter his definition. "A Hindu," said he correcting himself, "is a person who professes the Hindu religion." I confessed myself obliged for this highly lucid explanation, and was afterwards much exercised by a passage in Dr. Goldstucker's writings, in which Dr. K. M. Banerji is described as a Hindu writer.

Some time ago, I was attracted by the heading of certain extremely learned letter which appeared in the *Statesman* newspaper, from the pen of a well-known missionary resident in Calcutta entitled "The cow, the mother of the Hindus." Here at least, thought I, the wicked Hindus are going to be thoroughly identified—and that by means of their bovine ancestor. The learned gentleman, however, disappointed me by ultimately refusing to accord to the corrupt race the honor of so illustrious a descent, and corrected himself by saying that the cow was the mother not of the Hindus, but of their gods. So profound was the learning of this writer, that it would have been useless to attempt to convince him that the Cow is the mother only of calves, even in the imagination of the Hindus, and that the mother of the Hindu gods, was *Aditi*, the Infinite.

If any authority on the subject is to be respected it is that of Sir Alfred Lyall—the ruler of the most purely Hindu province in Hindusthan. Here is his description of Hnduism drawn as he thinks from actual experience.

"A tangled jungle of disorderly superstitious ghosts and demons, demigods, and deified saints, house-hold gods, tribal gods, local gods, universal gods with their countless shrines and temples and the din of their discordant rites; deities, who abhor a fly's death, those who still delight in human virtues, and those who would not either sacrifice or make an offering—a religious chaos throughout a

vast region never subdued or levelled (like all Western Asia) by Mohamedanism or Christian monotheism."

The appearance of this passage in Sir A. Lyall's *Asiatic Studies* you must accept as a guarantee that is not a free translation from some Spanish Missionary in Costes' army but a description of Hinduism which is at least equally applicable to the religion of the Aztecs, is to say the least, is an unfortunate one. Nevertheless an official document published by the Bengal Government (Census Report 1881, vol. I, p. 71), characterises this passage as describing the present state of Hinduism in India in words " which should be learnt by heart by all who wish to understand the religious position here."

And the same official document asks in despair " what is a Hindu? " and mournfully confesses that there never has been any satisfactory answer to the question, and there exists none (Census Report 1881, vol. I, p. 71). Nor is it for the first time that a government ruling over the destinies of seventy millions has confessed itself ignorant as to what forty millions of their subjects are in regard to Ethnology and religion. Mr. Beverley who reported on the first census, had put the same despairing question and had received to it the same mournful reply.

There is more wisdom in these official utterances than one would at first suspect. It is hard to define the words Hindu and Hinduism, because in the first place the word Hindu is used in two different senses, and next, because each of these different significations is itself exceedingly loose. There are Hindus by birth and Hindus by religion. Ethnologically, the signification is vague, because the term is applied to Aryans, as well as to non-Aryans, in cases where the latter have adopted the faith of the Aryans. The religious signification is loose, because it is applied indifferently to all the various religions professed by the Hindu race which the European had not at the earlier stage of his acquaintance with India, learned the name. Nothing can be more diametrically opposed to each other than the Sakta religion of the Tantras and the Vaisnavism of Chaitanya. The former delight in animal sacrifices, while to the latter the very language of slaughter

is an abomination; the former cling to the rules of caste with unflinching orthodoxy, the latter discard all distinction of caste. It is no exaggeration to say that there is greater affinity between Mahomedanism and Christianity than between the Saktaism of the Tantras and the Vaisnavism of Chaitanya. Nevertheless both these sects are classed as Hindus;—to the European they are simply different sects of Hinduism and the meek and abstemious Vaishnavism has to hear his share of the abuse levelled at the excesses of the Saktas—for are not both Hindus?

Is there not then such a thing as the Hindu religion? Search through all the vast written literature of India, and you will not except in modern writings where the Hindu has sought obsequiously to translate the phraseology of his conquerors, meet with any mention of such a thing as the *Hindu religion*. Search through all the vast records of pre-Mohamedan India, nowhere will you meet with even such a word as *Hindu*, let alone Hindu religion. Nay more. Search through the whole of that record, and nowhere will you meet with such a word as *religion*.

The word *Dharma*, which is used in the modern vernaculars as its equivalent, was never used in pre-Mohamedan India in the same sense as *Religion*.

The proper inference from this is not, that there were no Hindus in pre-Mohamedan India, or that the people had no religion. That would be to argue very like those Englishmen—happily a generation now nearly extinct, who finding no word in the vocabulary of the Bengali cooly or cultivator, which was the exact equivalent of the English word *gratitude*, drew the inference that gratitude was a virtue to which the Bengali was a stranger. The pre-Mohamedan Hindu called himself *Arya*, disdaining to include under the denomination the Indian whom he had conquered. For religion he had no name, because he never entertained any conception to which such a name would have been applicable. With other peoples, religion is only a part of life; there are things religious, and there are things lay and secular. To the Hindu, his whole life was religion. To the Euro-

pean, his relations to God and to the spiritual world are a thing sharply distinguished from his relations to man and to the temporal world. To the Hindu, his relations to God and his relations to man, his spiritual life and temporal life are incapable of being so distinguished. They form one harmonious and compact whole, to separate which unto its component parts is to break the entire fabric. All life to him was religion, and religion never received a name, because it never had for him an existence apart from all that had received a name from him.

A department of thought which the people in whom it had its existence had thus failed to differentiate, has necessarily mixed itself inextricably with every other department of thought, and this is what makes it so difficult at the present day, to erect it into a separate entity, and to define its nature. There is no Hindu conception answering to the term "Hinduism," and the question with which I began this letter, what is Hinduism, can only be answered by defining what it is that the foreigners who use the word mean by the term.

For, as you know, it is a word entirely of foreign origin. Originally *Hindu* was only the name of a river. The western neighbours of the early Aryan settlers on the banks of the Sindhu dropped the sibilant and substituted the aspirate. From the river, the name came in course of time to be extended to the dwellers on its banks; and from them again to all peoples of the same race and language with whom the same foreigners came into contact. It may be that all the peoples with whom they came into contact did not, even in those early ages, speak the same language. But all the languages were at any rate of common stock, and a foreigner would little understand provincial differences. The Hindus were then, in the eye of the foreigner, one people—of one race and one language, and it was assumed, and probably in those early ages at least, correctly assumed, that they had a common religion too. Any differences that may have a risen then would be imperceptible to the eye of the foreigner. The writings of the ancient Greeks who visited India so far as they are still in existence show that even those acute observers failed

to perceive any difference between Hinduism and Buddhism. Megasthenes and Ktesias apparently view the Brahmanas and the Sramanas as professors of the same religion.

If they assumed that the whole Hindu race had a common religion, that common religion very naturally received from its foreign critics the name of Hindu Religion. Mark now the sources of error that the further development of Hindu Society called into existence. The non-Aryan races conquered by the Aryans of India embraced the religion of their conquerors. And as a consequence of their embracing the faith of the Hindus, they too came to be ranked by foreigners as Hindus, though the Aryans themselves sternly refused to accord to them the honored name by which they distinguished themselves. The Hindus thus ceased to be one *race*. They soon ceased to be of one religion also, for the primitive faith soon developed itself into a multitude of independent religions. The differences in religion were, however, imperceptible to the foreigner who, without trying to understand anyone of the various systems, thought he discerned the same grotesque features in all; and the idea of a common religion of the Hindus has been retained to this day, and the supposed common religion has been honored by its European critics with the name of *Hinduism*.

Now in this use of the word Hinduism, there is a good deal of truth and a good deal of error. The truth that lies in it is this: all the various religions to which the name is applied have at least two features in common.

They are all sprung from a common source, and therefore hold many doctrines in common. They are all supported by sacred scriptures in Sanskrita, or in some other language sprung from the Sanskrita.

The errors implied in the use of a common name are manifold.

(1) The first is the application of a common name to diversified forms of faith sprung from a common stock leads, where the differences are not sufficiently studied, to attribute to the common faith a homogeneity it does not possess. That the various faiths are

all sprung from a common source, it is true, and it is true also that by reason of this community of origin, they possess certain features in common. The same however may be said, and would be even more true if said, of Judaism and Christianity. That would hardly justify the use of one name to designate both.

(2) Another error is that the religion of the Aryans of India has been the same throughout all history—that there is not only historical continuity but practical identity between the religion of the early Aryan settlers on the banks of the Sapta-Sindhu, and that of the modern Brahmans of Nuddia and Calcutta. Much light however has dawned upon our European critics* in the course of the last fifty years, and European scholars now confined the term Hinduism to the faith of modern India, while the earliest religion is called the *Vedic,* and the mediæval the *Brahmanic.* And the idea of all the religions sprung of the Indian stock having practically one religion conveniently designated by the name of Hinduism is also fast going away. The existence outside the pale of Hinduism of vast nations professing the Buddhistic religion has led to its recognition as a distinct faith, though theoretically there is no reason why it should be treated on a different footing from Chaitanya's Vaisnavism. The recognition of Buddhism as a distinct integral religion has led to the same honor being conferred on its kindred faith, and Jainism is now recognised as something which does not come under that comprehensive term. The national importance of the gallant defenders of the Anglo-Indian Empire has led to the recognition to [of] the faith of the Sikhs as an independent religion—though in reality it is one of its youngest offshoots. The same honor has been won by the splendid eloquence of Keshab Chandra Sen from admiring Europeans for the latest and smallest number of seceders from the great parent religion; and Brahmoism is believed by its foreign critics to be a formidable antagonist of the religion of which it seeks to be only a rational interpretation.

* Not apparently always upon my own countrymen. The following is an extract from a letter from so accomplished a native scholar as Dr. K. M. Banerji addressed to the *Statesman* and published in its issue of the ...... December, 1882.

(3) A third and a very serious source of error arising out of this extensive application of the term Hinduism is that much is now believed to be a part of the Hindu religion, which is not religion at all, but is purely secular. I have said that the Hindus never sought to distinguish between religion and other departments of thought and feeling; and as a consequence the same principles, the same considerations, and even the same authorities guided them in their religious and their secular life. That however is no reason why, now that we are able to distinguish between the two, we should take to be religion all that [which] without being such, happens to be connected with religion as parts of one whole. Yet no one takes the trouble, in his study of Hinduism to separate the one from the other. Much that is purely social ethics, or usage written down and raised to the dignity of the *Lex non Scripta*, is swallowed up by the voracious modern scholar as the essence of Hinduism. It is at least as certain that the Hindus had their social polity, their *codes* of Ethics, their folk-lore, and their popular observances, as they had a religion; and it happens from the peculiar encyclopædic character of their literary productions, that the same treatise has something to say on every one of these subjects. But that same rapacious animal, the modern scholar, seizes and gulps down the compound mixture as the pure article he was in search of. When talking of Hinduism, he entirely forgets that there is such a thing as secular Hinduism. Everything Hindu is merged into that whirlpool of things—the Hindu religion.

I have not yet done with this monstrous nature of misuse of a name. I have to point out a fourth error. Not only is Hinduism, under the name of Hindu religion, held to include all Hindu religions past and present, all things Hindu whether religious or secular, but also such that never has had any connection with 'anything Hindu, religious or secular.' Non-Aryan customs and observances retained by non-Aryan tribes converted into Hinduism, non-Aryan fetishism, popular superistitions without any warranty in Hinduism, and only similar to those that are to be found in every country Christian, Mussulman or heathen, nursery legends disseminated by old crones

for the edification of class-going children, and such every other subject of popular or juvenile belief is pressed by the critic of Hinduism into his service, and a monstrous caricature of a national faith is thus manufactured and described in eloquent language, "as a tangled jungle of gods, ghosts, demons and saints," and other monsters, language which admiring statisticians call upon all students of Hinduism to learn by heart.

Let us eliminate all these sources of error. Let us rid our conception of Hinduism of this "tangled jungle of ghosts, demons and saints," and such other articles of belief which are to be found in every country and among peoples of all creeds, and which are no more essential parts of Hinduism than they are of Christianity. Let us free it also of all that is not properly religion but social polity or domestic morality, the unwritten law of the country, or general culture. Something of this no doubt will have to be included in Hinduism, if you conceive religion, as I think you do, to be a system of social culture, and I shall give to this point due consideration at its proper place. There will still remain a vast quantity of matter utterly foreign to religion which will have to be excluded. Thirdly, the term Hinduism has to be restricted to the articles of religious belief accepted by Hindus generally at the present day in exclusion of the Vedic and Brahmanic faiths out of which Hinduism evolved itself. Lastly, we have to remember that these articles of faith vary from province to province, differ in different sects in the same province, and even among individuals in accordance with the culture, or the mental constitution of the individuals concerned. Yet among all these varieties and divergences, will be found some common features, certain fundamental principles which form the basis of all. These fundamental principles will be found sufficient to constitute a religion in themselves, and this religion is Hinduism.

In thus restricting the application of the term Hinduism I do nothing which is arbitrary. I merely insist that if you wish to denote by it an existing religion, you must confine its application to an existing religion, and exclude all that does not properly belong to the

existing religion. If you seek to define Christianity, a Christian has a right to insist that you should restrict the definition to that which forms the common basis of the various denominations of Christianity, and exclude all that is not common to them all. You must then necessarily exclude the image worship and saint worship which is peculiar only to certain forms of Christianity, exclude also the belief in ghosts and demons which still obtain in many parts of Europe; throw out of consideration the folklore of European peoples, nursery legends and pre-Christian legends like those [incorporated] into the *Edda* and the *Niebelungen Lied;* the leaven of Greek Paganism, which purely as an aesthetic element, has found its way into the literature of Christian countries and exclude many things beside. You must also distinguish it from the Judaism out of which it has sprung. Fancy what a conception of Christianity you would arrive at, if you included in it all this, and not only all this, but also the political and social constitution of Europe, its codes of morality, its jurisprudence, its international law and its legislative enactments. Nay, go on further. Give to Dante and to Milton in Christianity the place now occupied in the ordinary conception of Hinduism by the Ramayana, and the Mahabharata, to Tribonian and Puffendrof, to Montesquieu and Bentham that of Manu and Yagnavyalka, Gautama and Parasara; to the legends of King Arthur and to the Romance of the Cid, to Ariosto and to Tasso, the place of the Puranas, to Spinoza that of Badarayana; and give to the writings of the early fathers, what they once possessed, the sanctity and authority of the Upanishads; and you will then arrive at a notion of Christianity very similar to the notion of Hinduism [to] which the ignorance, the intolerance and the contempt of foreigners and the degeneracy of natives have reduced it.

I do not exaggerate. Suppose a Hindu, ignorant of European languages, travelled through Europe, and like most Europaens in his situation, set about writing an account of his travels. What would be his account of Christianity? Observing the worship of the Virgin and the Saints in Catholic countries, he would take Christianity to be a Polytheism. The worship of images would lead him to believe, that

Christianity was an idolatry also, and the reverence paid to the Crucifix would induce him to think that there was also a leaven of Fetishism in it. Protestant Christianity he would account to be a Dualism, a religion of the Good and Evil Principles,—a religion of God and the Devil. And if he mixed well enough with the ignorant peasantry of Christendom, he too would meet with that tangled jungle of ghosts and demons which it has been Sir Alfred Lyall's lot to meet with in India. And who shall say that the Hindu's account of Christianity would be wider of the truth than many an account of Hinduism by European or native?

To return to my definition of Hinduism. It will exclude as I have advanced, much that is popularly considered to be a portion of Hinduism even by Hindus themselves. That, however, is not and ought not to be an objection against the definition. It is precisely popular delusions of this sort that have encrusted Hinduism with the rubbish of ages—with superstitions and absurdities which subvert its higher purposes; and which it is the duty of every true Hindu, actively to assail and destroy. The noxious parasitic growth must be exterminated before Hinduism can hope further to carry on the education of the human race. Hinduism is in need of a reformation;—not an unprecedented necessity for an ancient religion. But reformed and purified, it may yet stand forth before the world as the noblest system of individual and social culture available to the Hindu even in this age of progress. I have certainly no serious hope of progress in India except in Hinduism*—in Hinduism reformed, regenerated and purified. To such reformation, it is by no means necessary that we should revert, like the late Dayananda Saraswati to old and archaic types. That which was suited to people who lived three thousand years ago, may not be suited to the present and future generations. Principles are immutable but the modes of their application vary according to time, to circumstances. The great principles of Hinduism are good

* "For a system to rise and be generally adopted it must during the greater part of the period of its supremacy be to a considerable extent in agreement with our nature and far from unfavourable to our peoples." *Catechism of the Positive Religion*, p. 384. Congreve's Translation, 1st edition.

for all ages and all mankind—for they are based on what Carlyle would call the "Eternal verities," but its non-essential adjuncts have become effete and even pernicious in an altered state of soceity. It will be one of the objects of these letters to show what these non-essential adjuncts are. I shall describe what true Hinduism is by showing what false and corrupt Hinduism pretends to be. Let us not be awed and silenced by the imposing authority of ancient names, or be led away by pretended learning or antiquated jargon. Let us look steadily and boldly into the face of things; discard falsehood whenever we meet with it, hoary and hallowed by time though it may be; and if in our search we meet with Truth, let us drag it out of the darkness under which it was hid, and enthrone it in the light of Heaven. Let us revere the past, but we must, in justice to our new life, adopt new methods of interpretation, and adopt the old eternal and undying truths to the necessities of that new life.

LETTER III

I said in the last letter, that I define Hinduism as consisting in the fundamental principles which underlie various religious faiths of the modern Hindus. Hinduism, in the ordinary acceptation of the term is protean in its form. There is a monotheistic Hinduism, a dualistic Hinduism, a polytheistic Hinduism, a pantheistic Hinduism—and unless we resolutely exclude Buddhism from the group of Hindu religions—there is also an Atheistic Hinduism. There is a Ritualistic Hinduism, and a non-ritualistic Hinduism; there is a Hinduism of Asceticism; there is also a Hinduism of gross sensuality; there is the humane Hinduism of the Vaisnavas; and there is also the cruel and blood-thirsty Hinduism of certain Saivas and Saktas. There is the liberal and sympathetic Hinduism of the followers of Kabir and of Chaitanya; and there is also the illiberal and bigoted Hinduism,—one of its very worst form, which finds an expression in some of the ordinances of Manu. In spite however of this diversity, even this frequent antagonism, there is a common basis for all; certain fundamental principles which all accept, and which therefore alone is Hindu Religion. That which is outside this common basis, is excluded as being merely the special characteristic of some particular sect, with which the modern unsectarian Hindu has no concern. But besides their sectarian specialities, certain other things are also excluded from my definition, as not pertaining to religion. This exclusion indicates a grave defect in my defintion or explanation whatever you may call it. I have tried to define the Hindu religion, without any explanation as to what I understand by religion. This is precisely the point where those who may take objection to the exclusion, are likely to join issue with me. Nor is this point quite easily settled. With many, religion is only theology—there are others who will consent to give the name to anything which excludes their own creed. A very ordinary idea of

religion is that it is a system of worship and sacrifice. So eminent an authority as Tylor, define religion to be "a belief in spirits;" spirit being with him a general name for god and ghosts. Positivists give quite rightly the name of religion to their own system, which utterly ignores and puts entirely out of court that theology to which alone the professors of religion have hitherto restricted the name. We have heard of a religion of Art, and a religion of Science. (See *Natural Religion* by the author of *Ecce Homo*. What then is religion?

Now I should trouble myself but little as to the fate of the Hindu Religion, or of any religion at all, if I accepted religion in the sense of the theologists or of philosophers of Mr. Tylor's school. I should leave my countrymen to believe or disbelieve in ghosts, spirits or gods at their pleasure. I yield to none in the firmness of my conviction in the existence of Great Authors of Nature and my trust in his providence, but I should care little whether my countrymen, or anyone else in the world, accepted the doctrine of His existence and His Providence, if I found that such acceptance enabled them to make an approach to Religion. I am not one of those who think that a belief in God, or in a number of gods, or in a future existence, or anything else which does admit of proof, constitute religion. But when such belief, or any belief whatever, furnishes a basis for conduct—for the conduct of the individual towards himself as well as towards others, when by becoming a common faith and therefore furnishing a common basis of conduct, it becomes a bond of union between man and man, a standard by which human existence individual and aggregate, comes to be regulated, it is religion. This is a very large definition, I admit. Religion, viewed thus, is in theory a philosophy of life; in practice it is a rule of life. It includes our beliefs, and the principles of our conduct founded upon those beliefs.

Now, test this definition by taking as an illustration an extreme case. Take the case of the Utilitarian. He has a rule of conduct,—the greatest good of the greatest number. No one has ever dreamt of applying the name of religion to simple Utilitarianism. But why, I ask, does the Utilitarian seek the greatest good of the greatest number?

Why does he seek the good? Because he loves the good. He is a worshipper of the good. That is his Religion. Nor is his religion a wholly false religion, for the good is entitled to our love and our worship, and to regulate our conduct. It is so far a false religion that it does not take cognizance of what along with the good claims our love and worship, and to regulate our life. It takes cognizance only of one of the aspects in which man and nature are presented to our apprehension. Add to it, the worship of the Beautiful and the true, and you have a complete religion. Add to Morality, Science and Art, and you have a complete guide to life.

You may reply to this, that this is culture, not Religion. I may reply to you, in the words of a writer, whom we both admire, that "*the substance of Religion is Culture*" (*Natural Religion* by the author of *Ecce Homo*, p. 145).

I hope however to return to this point in a future letter and shall now say no more. There may however be raised what certainly appears at first, as a much more formidable objection to this view of Religion, by those whom you, as a positivist, put out of court as supernaturalists. If the worship of the Good, the Beautiful and the True, suffice to form a complete religion, and is true religion, what becomes of the belief in a personal God and his Providence? This view of religion they may say, simply dispenses with it as an idle and unnecessary fable. By no means. I accept the worship of a personal god as the highest perfection of religion. A personal God alone realizes the highest and most perfect ideal of the Good, the Beautiful and the True. In that Ideal alone is realized the complete Unity and Harmony of Goodness, Truth and Beauty. If Religion is Culture, the worship of such of a perfect Ideal is by far the most important means of Culture.

What I really mean to say is, that what is called Supernaturalism is by no means essential to Religion. I believe firmly as I have said in the existence of God, and in His Providence, but I do not hold that any system of religion which does not believe in God and in His Providence, is no religion at all, or even that it is an incomplete

religion. What I do hold that such a Religion is *imperfect* religion, though not necessari [ly] an incomplete religion. Completeness does not necessarily perfection. Completeness is attained when all the component parts exist, perfection when the component parts and the whole they form are exactly suited [to] the purposes they are destined to answer. Completeness has reference to unity; perfection to quality. A regiment is complete when it possesses the full complement of soldiers; it will nevertheless be imperfect if it is deficient in fighting qualities.

I may return to this subject in a future letter. Let me at present return to the more immediate purpose of this one. Religion, then, is a philosophy of life, and the principles of conduct flowing from it. Now take note that this conduct has to be distinguished from the principles themselves. In conduct, you apply a certain principle which you have accepted to the circumstances before you; the result is your conduct. The application may be erroneous; nothing is more common than erroneous applications of right principles. The principle may be good, but if the application is erroneous, the resulting conduct will be bad. The fault lies not with the principle on which you have acted, but in your own judgment. It would be absurd if the principles of Christianity were held responsible for all the wars, all the massacres, all the murders that have been committed in its name. Yet nothing is more common than this absurdity in respect of Hinduism. The principles of Hinduism are confounded with their erroneous application; and Hinduism is accused, judged and condemned because its principles have been misunderstood and perverted. If you hold that the principles of Christianity are not responsible for the slaughter of the Crusades, the butcheries of Alva, the massacre of St. Bartholomew or the flames of the Inquisition, I do not see how any one can hold the principles of Hinduism responsible for the immolation of Hindu widows on the funeral pyre. If the principles of Christianity are not responsible for the civil disabilities of Roman Catholics and Jews, which till lately disgraced the English Statute Book, I do not understand how the principles of Hinduism are to be held responsible for the civil disabilities of the Sudras under the

Brahmanic regime. The critics of Hinduism have one measure for their own religion, another for Hinduism. Principles and their erroneous application are distinguished in the case of the one, they are confounded in the case of the other.

And it was to guard against this confusion that I sought in the preceding letter, when I warned you against confounding Hinduism, or the Hindu religion, with what is not religion at all. Examine for a moment what this confusion means.

Hinduism, I have said, consist of certain fundamental principles which constitute a religion. Those fundamental principles must consist, if my view of Religion as a whole be accepted, of a body of doctrines, which constitute the theoretic belief of the Hindu, as well as the Elementary basis of his practical life. The principles which form the basis of practical life, came to be applied as Hindu society developed itself to the large problems of social existence. Thus came into existence a Hindu system of Ethics, Hindu systems of Philosophy, Hindu systems of Law, and a complicated social polity of which caste is a prominent feature. These were more or less based on practical applications of the principles of the Hindu religion, but are not the principles themselves. They have no more right of being considered as component parts of the Hindu religion, than the philosophy, or the moral theories, or the international Law of Europe as component parts of Christianity. And yet it is chiefly, if not wholly, on account of what is thus no part of Hindu religion, but often erroneous and corrupt application of its unquestioned principles, that Hinduism is reviled by foreigners and rejected by their native disciples. If the ultimate principles of Hinduism be found true and sound, and the practical applications of those principles erroneous, the wise course is not to subvert and annihilate Hinduism—which is now the cry of educated India, but to discard the erroneous applications and to remodel life in accordance with its true principles. That is the direction in which Religious Reform is most desirable, and in which alone I trust is its success possible.

You will now see why I have devoted two entire letters to a

definition of the term Hinduism. The extremely loose signification attached to it lies at the root of the whole mischief. [You as a positivist, and I as a Hindu, equally deplore the irreverence for the past, the dissociation with the dead and deathless teachers of Ancient India.] It is as if you gave the name A, sometimes to B, and sometimes to C, and then proceeded to take for granted that B and C are the same things. If you never learn to discriminate between the two, you will never learn much about either of them. Though one may be pure gold, and the other dross, you will either fling the gold after dross, or treasure up the dross with the gold. That is precisely the position of Hinduism. While the mass of the people cherish Hinduism, and with it, all its conceptions, its accretions, and its adjuncts, good or evil, the educated classes reject the whole. The one class treasures up the dross with the gold, while the other is flinging the gold after the dross.

LETTER IV

The two foregoing letters but little advanced us in our search after a clear conception of Hinduism. I have defined it to consist in the fundamental principles underlying the various denominations of faith professed by the Hindu peoples, but I have not said what those fundamental principles are. I am going to begin.

The fundamental principles do not lie on the surface. Hinduism in this respect labours under a disadvantage. It is not a religion founded and made symmetrical by a single founder. In the case of the great religions of the world the foundations of which were laid by individual founders, the governing principles lie on the surface. The very acceptance of a new Religion depends on the ease with which its principles can be apprehended by outsiders. The necessities of a new Religion induce the founders to give the utmost prominence to the fundamental principles. It thus becomes, at its very inception, a symmetrical work of Art. Indeed, it may be said of the great Historic Religions of the world, which owed their origins to individual founders, like Christianity or Mohamedanism, that at the outset there was little in the religion beyond the fundamental principles themselves. The legends and the rites, the mythology and the superstitions come afterwards. It is easy therefore to formulate the fundamental principles of such a religion; and when they are thus formulated, they easily carry assent.

Not so with Hinduism. Hinduism has had no founder human or divine. It never sprang forth, like Minerva from the head of some Brahminical Jove, armed and equipped for the conquest of the World. It is, like hundreds others of less known and less developed forms of faith—the product of nature. It sprang out of the necessities of primitive life and grew with the growth of culture. Its origin lies veiled in the mist of ages hidden in that impenetrable gloom of pre-

historic culture. It has developed itself from rude and simple beginnings, grown during the lapse of thousands of centuries, developed itself according to the necessities and the tendencies of the Hindu race, and has assimilated a vast quantity of foreign matter with which it came into contact. It is overlaid with a veritable "tangled jungle" of superistitions and absurdities which hide its proportions from the observer's view. There is no symmetry discernible in a structure of such spontaneous development. It is not the work of human Art, with its parts regularly arranged along definite lines. The development has no doubt proceeded along central lines of thought, but the overgrowth and rubbish have first to be swept away, and the whole has to be patiently surveyed, before these can be discerned.

To such a survey, it is necessary at the outset clearly to map out the whole field to be surveyed. Let us do so.

I have said that Religion is a Philosophy of life in theory, and in practice, principles of conduct in harmony with that philosophy. If Hinduism is a religion, we should expect to find it to consist of such a philosophy and such principles of conduct. The theoretical or philosophical religion is found in all cases to consist of a body of received doctrines; and the principles of practical conduct find expression in a system of worship, or rites and a code of religious morality. The doctrines of Hinduism have to be sought in a vast mass of literature, and are there taught either in the shape of legends or as dogmatic philosophy. The two often get intermixed. The legends often teach genuine philosophy while the dogmatic philosophy is very often found to consist of legendary materials. We shall begin with the legends, and then pass on to the dogmatic philosophy which developed itself out of the legends. I shall next take up the Hindu worship, its rites and sacrifices, and conclude with a survey of the ethics of Hinduism.

It is convenient to begin with the legends, because in them lie imbedded the early history of religion. The received legends of Hinduism are in themselves later developments of the historic myths,

and it becomes necessary to begin with the pre-historic myths themselves.

And here the Hindu has to acknowledge an immense debt to European scholars. The researches of European scholars have converted what was once unintelligible nonsense to a subject of accurate scientific study. What was hitherto unnecessary and meaningless, has now been shown to be a necessary condition of primitive culture, and full of deep signification. A myth can now be traced back from its ulterior development to its origin. The formation of myths has been found to be due to two distinct principles. One is the reflex action of language. The other is the action of the belief so universal in primitive man in the animation of all nature, that is in the production of phenomena by operation of Life and Will. To this has been given the not inappropriate name of Animism.

You are in such complete possession of the results of European research on this subject, and I dare say the same can be said of my educated countrymen in general that it is unnecessary for me to enter into detailed explanations. I shall content myself with an illustration or two.

Language and Animism have generally acted in concert in the production of myths. Language first names an object. The necessities of language require that there should be some correspondence between the name given and the object named, or in other words, that the name should be descriptive of the object. Now animism steps in. The object becomes a Personal Being, with Life and Will. The descriptive name now passes into a personal name. The attributes signified by the descriptive name become personal attributes of the personified object. Thus springs into existence the myth of a Supernatural Being animating a natural object, and possessing definite personal attributes. And names come to multiply, as each object becomes better and better known, and its properties and influences are better studied. As names multiply, the attributes multiply, each attribute comes to have a history of its own, until a simple natural object becomes the centre of a host of mythic legends.

You know how the Sanskrit word *Dyaus*, which you meet with in the first couplet of Amara Sinha's Lexicon, came to be the name of the bright Heavens. It is derived from a root *Div* to shine. The name originally meant simply the Bright or the Shining One. By and by the Bright Heavens were personified and the *Zeus* of Greece, the *Jovis* of Rome, the *Jui* of Germany, is this same bright sky, *Dyaus*, personified. Once personified, so great an object as the vast and magnificent sky had an attribute assigned to it, commensurate with its greatness. It was the father of the human race. So it became Dyaus Pitar in Sanskrit, Zeus Pater in Greek, and Jupiter in Latin. Nor is the conception of the human race confined to the Aryan nations only. You will find [it] in the *Tien* of the Chinese, among the Maoris, in Polynesia, among American races and in fact all over the world. Now mark how a myth continues to develop itself. If the Heavens are the father of the human race, they must have a mother too. And who so fit to be the consort of the wide-spreading heavens but the wide-spreading Earth herself ? So by and by we have *Prithivi matar* in Sanskrit, *Ouranos* and *Gaia* (names of Heaven and Earth) among the Greeks, Chinese legends and *Maori* legends about mankind being the children of Heaven and Earth, an Earth mother among Peruvians, *Caribs*, Aztecs, and other American races, and even among Scythians. The forefathers of our English rulers, the Anglo-Saxon held that *Hal mes the folde, pra modor.*(?)

Now mark how legend passes into Philosophy. The mythical conception of Heaven as the father and Earth as the mother, of the human race was converted by the Chinese into a philosophical conception of two great principles in nature, the *Yu*, and the *Yung*, the one male, the other female, the one heavenly and the other Earthly. And the Brahmans of India formulated the same doctrine with greater elaboration and philosophical dignity in the Sankhya theory of Purusha and Prakriti. How this philosophical doctrine influenced the later religious faith of India, and even its secular literature, is a point on which I need not enlarge.

Another illustration, and a most beautiful one, I give in Professor

Max Müller's own language. "Before the Aryan nations separated, before there was a Latin, a Greek, or a Sanskrit language, there existed a root *Swar* or *Swal* which meant to beam, to glitter, to warm. It existed in Greek Selas splendour Selene moon, in Anglo-Saxon, as *swelan*, to burn, to sweal, in modern German, *Schwül*, oppressively hot. From it we have in Sanskrit the noun *Svar*, meaning sometimes the sky, sometimes the Sun; and exactly the same word has been preserved as *Sol*, in Gothic as *Sauil*, in Anglo-Saxon as *Sol*. A secondary form of Svar is the Sanskrit Surya, for Svarya, the Sun, which is the same word as the Greek *Helios*.

"All these names were originally mere predicates, they mean bright, brilliant, warm. But as soon as the name Swar or Surya was formed, it became through the irresistible influence of language, the name, not only of a living but of a male being. Every noun in Sanskrit must be either a masculine or a feminine, (for the neuter gender was originally confined to the nominative case), and as Surya had been formed as a masculine, language stamped it once for all as the sign of a male being, as much as if it had been the name of a warrior or a King. In other languages where the name for a Sun is feminine and the Sun is accordingly conceived as a woman, as the bride of the moon, the whole mythology of the love-making of the Heavenly bodies is changed."

Observe again how the myth proceeds to develop itself. If the sun is a male being, he must have his wife or wives. An unmarried Divinity, like the Kumara of later fiction, is an abhorrence to the spirit of legend. So the Sun is endowed with a couple of wives, one of whom is a very intelligible person, and must have sprung to her position very early. She is no other than his invariable campanion —*Chhaya* or the shadow. And being a married God, of course he has a progeny. One of his sons, is the great Lord of Death. Another is the river Yamuna. You see at once that the early settlers in the land of the Sapta Sindhu, should name the Yamuna, which was to them an *eastern* river, the Child of the Sun, a metaphor which settled her paternity for ever in Hindu Mythology.

Thus myths are formed and grow. They are by no means the special property of the Hindus, or even of the Aryan races. The evidence collected by European writers, and especially by Mr. Tylor shew that they lie wide-spread throughout the world. Every primitive religion is a religion of myths : and the religion of the primitive Aryan was also a religion of myths. To a people in a low state of culture hardly any other religion was possible. And in a very low state of culture it is as a religion sufficient for all practical purposes. As however a people advances in culture, higher religious conceptions take the place of the primitive myths. The myths are not forgotten; they still retain a place in the national recollection of the people, but only as folk-lore. So it was with Hinduism. As religious conceptions advanced, the legend sank to a subordinate place, the front rank being taken by the great systems of religious philosophy. In a country however where literature was the exclusive occupation of a large intellectual aristocracy, everything would and did find a place in literature, and among other things, the folk-lore. Owing to the encyclopædic character of Brahmanical compilations, the folk-lore found their place in the same treatises which among other things treated of the higher religious philosophy, and in the age of degeneration and decay which followed, ignorance led to the same reverence being accorded to all that was founded within the limits of the same literary compilation. The time has come when all this must be rectified, and the sacred legends of Hinduism receive from us that treatment which is their due but no more. And the treatment which is their due is not one which should consist either in contempt or in indifference. They have a deep signification of their own. They should be lovingly and reverentially studied in order that the true Hinduism latent in them may be discovered, and treasured up in the heart, and the spurious Hinduism patent in them may be denounced and discarded. The spurious Hinduism is in their literal interpretation; the true Hinduism is in their historic interpretation. I proceed to give a few illustrations.

Let us begin with one of the worst Pauranic legends. It is that

of Indra and his relation with the wife of his spiritual preceptor. You know the legend, and I shall not take upon myself the unenviable office of narrating it. Suffice it to say that as it stands, there is scarcely anything more gross or disgusting in the whole mythical literature of the world. The highest of the Vedic Gods, the Pauranic King of Heaven is described as committing a crime revolting to the coarsest ruffian on earth; and a punishment is meted out to him the grotesque obscenity of which surpasses even the atrocity of the crime itself. The revolting drama finally closes upon the *thousand eyes* of Indra. The assailant of Hinduism triumphantly points to the infamous legend as a specimen of the faith of which Hinduism is composed and exhorts the doomed race to forsake the accused faith. The degenerate Hindu, who believes all things and understands nothing, hangs down his head in shame before the triumphant assailant of the creed of his fathers.

Not so the true Hindu. He sees at a glance that the myth has a far deeper signification than this false though strictly literal explanation. He ascends from the Pauranic to the Vedic Indra, and from the Vedic Indra who delights in the Soma juice and slays Vritras to the pre-Vedic times when Indra was simply the Firmament. He sees that Indra from the root was simply the . . . . , a descriptive name given to the Firmaments by the early fathers of the Aryan race. The moment he lights upon the Firmament as the true Indra, he at once comprehends the legend of Indra's thousand eyes—the thousand eyes of the *Starry Heavens*. It is not filth, but sweet, beautiful poetry—the poetry of human infancy and if he is at all a student of classic mythology, as certainly he ought to be, he will find that the legend of Indra's thousand eyes is not the only form in which this pre-Vedic poem still survives in the world, and that there is a *Hellenic* version of it in the legend of the hundred-eyed *Argus*, and that educated Greeks made a clear recognition of the myth. But what will impress and instruct him most, is the interpretation which the true spirit of Hinduism had put upon the original myth. The Starry Heavens were only a part of the Great Being who pervades

the Universe. The thousand eyes were therefore an attribute of the Great Being—the God of Pantheism. In the Purush Sukta of the Rig-Veda he is already described as *Sahasraksha*—thousand-eyed. The Great Being soon developed itself into a Personal God. The Personal God is *Bhagabat.* The word which gives him this name signifies totality of six attributes, viz., *Jnana* (knowledge), *Aiswaryya* (Lordship) *Sakti* (power), *Bala* (strength), *Virya* (Heroism), and *Teja* ( ). He is *Bhagabat,* because he possesses these attributes. Hinduism attributed to him these in Infinite Perfection, by attributing to him these attributes a thousand-fold. It was an expression of reverential awe of Infinite Perfection truly characteristic of Hinduism. But unfortunately the word from which Bhagabat derived his name, had also another signification, and the first of the two meanings being mistaken for the second gave rise to the disgusting legend of Indra's crime and punishment. It is the province of the educated Hindu to restore the grand meaning of the primitive myth, and to treasure it up as true sacred History—Sacred History in the sense of a history of true Religious conception.

I have taken here as a test case one of those legends which appear to the superficial observer one of the most atrocious of Pauranic legends. The silly contempt entertained on similar grounds by the blatant section of our half-educated countrymen, and by their half-educated European preceptors, tempt me to bring in, as further illustrations, the glorious legends of Radha and Krishna. The place of these legends,—legends, they scarcely can be said to be,—is so important that they require a separate letter by themselves and I must reserve them for detailed discussion. A single observation must here suffice, in regard not only to these, but in regard also to the cognate legends in the Tantras. I have already explained how the primitive myths of *Dyaus Pitar* and *Prithivi Matar* coalesced and developed themselves into a Dualistic Philosophy—into the doctrine of *Yu* and *Yung* among Chinese philosophers, and in the highly elaborated *Sankhya* doctrine of *Prakriti* and *Purusha.* In spite of its incomparable logic, and its profound analysis, the Sankhya is a cold

and dreary philosophy, a gloomy pessimism, taking an attitude of intense hostility to nature. It does not shrink from asserting that all life is misery. It sees no solution of the great problem of life, the relief from misery in nothing but knolwedge. And knowledge is of value in its eyes only as furnishing the means of the dissociation of the Soul from Nature. This docrine strikes at the root of all true Religion. It is the union of Soul with Nature—in the harmony of man with all that is outside himself—that lies true Religion. For here alone lie the sources of the Beautiful, and Truth, and Goodness. Here alone is true culture. And the lofty instinct of Hinduism, which is pre-eminently the religion of Culture, entered its protest against the barren doctrine. Legends based on previous traditions, and now elaborated and polished by gifted bards and profound philosophers were the shape into which the protest against the Pessimism of the Sankhya was thrown. These legends ran in two different grooves. One set gathered and took shape round a mythic Radha, representing Nature, with the historical Krishna representing Soul or the Purusha. The other set typified Nature in Sakti and Purusha in Siva, and were finally elaborated and systamatized in the Tantras. The Radha myths represent the Religion of Love; the Sakti myths the religion of Discipline. With both Religion is Culture.

One of the most beautiful of these legends—untarnished and uncorrupted even down to the present day—is the story of the Destruction of Kama, the God of Desire. I need not give it at length; it is well known, not only to my own countrymen but even to European scholars, for it forms the subject of the most perfect poem in the Sanskrit language, the Kumar-Sambhava. In Kalidas's hands however it has received a remarkable development. Uma, the daughter of the Mountain and the heroine of the poem, represents External Nature and is the perfection of physical Beauty. But External Nature is not the whole of nature, and physical Beauty by itself it not the perfection of Beauty. The perfection of Existence is the result of the union of Nature with Soul; of the Physical with the Super Physical; of the Beauty with Truth and

Goodness; of the Human with the Divine. That is the action of the Poem—the marriage of Uma with Siva. But this union can be accomplished only through a sacrifice—the greatest feasible to nature, the sacrifice of Desire. This is the Destruction of Kama. In the poet's view, Nature and Soul, are the two complementary parts of one Great Whole, and in their union consists the perfection of existence. Such is the last phase of the great protest of Hinduism against the pessimism of the Sankhya.

Take again one of the minor myths. Many primitive races have believed, and still believe that the passage to the other world lies across the water. It is a widely spread myth. The classic Styx and Acheron are familiar even to the Hindu student of European literature. There was even a time when the very island whose queen is India's Empress was believed by people living on the continent to be the home of the Dead—who were supposed to be ferried over the channel by mysterious ferrymen rising at dead of night at the summons of some supernatural messenger. The Hindu myth corresponding to it is that of the *Baitarani*. Mummery and superstition can hardly go further than the length to which this interpretation and corruption of this legend have led. An insignificant stream bearing this name was met with in Orissa and notwithstanding that the ancient Scriptures locate the Baitarani at the Portals of Death, in utter darkness, ("Yama Dware mahaghore tapta Baitarani Nadi")—the little stream in Orissa was at once identified with the terrible gulf between the two worlds. Even at the present day thousand of pilgrims flock every year to the little town of Jajapur, and there anticipate in life-time the solemn ordeal of the passage to the other world by a pleasant trip across the dry and sandy bed of the little river. The solemn farce is played out in earnest, and the whole is made exquisitely rich by the addition of a cow to the scene of whose tail, the pilgrim takes a firm hold as an aid in his perilous voyage. The anticipations of peril, I am glad to say, are in a few cases realized in the shape of a few smart kicks from the bovine guide.

Now the unfortunate pilgrims might have spared themselves all

this mummery if they had for a moment reflected on the meaning of the word Baitarani. It cannot possibly mean that which is crossed, though it may mean that by means of which we cross; it may mean, I say, because the simpler form, *tarani* still means that by means of which we cross namely, a boat. But on the face of it, the word Baitarani, is a derivative from *Bitarana*, the act of giving away, and the whole meaning of the Hindu legend is that in deeds of charity lies the easiest passage from this world to the next.

I might go on multiplying instances to any length. Owing to the vast bulk of the written religious literature of India, India is richer than almost any other religion. It is impossible to treat exhaustively of this vast body of legends within the compass of a single treatise, and it is beyond the scope of the present to treat of any large number of them. My object in this chapter has been to illustrate by means of a few typical passage, the nature of the ground which these legends occupy in Hinduism. A few additional observations in the legends I reserve for the next chapter.

CHAPTER V

I shall be misleading the reader, if I led him to believe that all the Pauranic or other legends are capable of the same treatment as the foregoing. It would be neither even true that they are all merely later developments of primitive myths. A very large number of them are simply history—the record of past events exaggerated, inaccurate, and perverted accounts they may be—but nevertheless resting on a genuine basis of tradition. The history of the Pandavas, and that of Rama, are now universally admitted to be legendary history. They form no part of the Hindu religion—they are either history or poetry. With two remarkable exceptions the legendary heroes are nowhere the objects of worship. The two exceptions I mean are Rama and Krishna. The legends of Krishna do form the basis of a considerable portion of Hindu faith, and will require separate treatment. In the Rama legends there is nothing which is not either secular history or secular poetry; and in the Ramayana of Valmiki it is rarely that Rama appears in the character of a Divine Being. I shall have to return to Rama on a future occasion.

Euhemerism has by no means been absent from India, and many attempts have been made to explain, both etymologically and metaphysically many of the Hindu legends as allegories. Rama, for instance, is Goodness or Virtue, Sita, Purity, Ravana, Wickedness, and so on. It is needness to say that such efforts are perfectly worthless. I think similar ingenuity will enable any clever schoolboy to prove that the history of the Sikh wars is an allegory. Tej Singh and Lal Singh and Gulab Singh and Ranjit Singh and Hardinge and other names will serve his purpose admirably. Yet it is nevertheless true that a very large number of legends in the Puranas and other sacred books of the Hindus, perhaps the majority of such legends are allegories,—many of them are allegories of the very highest poetical merit or philosophical

value. Primitive myths are rarely allegorical, and all attempts at allegorical explanations of these are unscientific. But the case is different when, in a highly cultured society poets and philosophers undertake to teach wisdom in parables. The Puranas were compilations embodied in which are nice allegories. I shall refer here as conspicuous instances to the Buddhistic legends explained with such remarkable ability by Dr. Rajendra Lala Mitra in his work on Buddha Gaya, and to the purely Hindu legends similarly treated by Babu Bhudev Mukherjee in his beautiful little book "Pushpanjali." That a legend should be an allegory is a matter so easily understood that I do not consider it necessary to burden this work with illustrations.

But what I specially wish the reader to guard against is the tendency to regard all explanations of legends as allegorical. I have known instances in which philological explanations of Sun-myths have led to their being characterized as "Solar allegories." There are others again who confound the case of a historical person taken to be the representative of a principle, with allegories in which principles are personified and invested with a historical significance. The explanations of the legend of Radha and Krishna given in the preceding chapter, may from this confusion, be mistaken to be allegorical. It is the very reverse of allegorical. The distinction is that in the one case, abstractions are personified; and that in the other persons with a historical existence come to be vested with the attributes of abstractions.

Thus we find among the legends of Hinduism, legends some of which are pure native myths. Others again are philosophical legends developed out of primitive myths. A third and a very large class of legends are pure history, or poetry super-added to history; and a fourth class are pure allegories. There is still however a fifth class, and these are very numerous and important. They will be found to be neither pure myth, nor pure history, nor philosophy, nor allegory but all together. They have been generally formed by the agglomeration of various kinds of legends round a nucleus, and present composite structures which it is always easy to pull down and take to

pieces. As an instance in point, I call attention to the story of the ten incarnations of Vishnu.

Vishnu himself is a central figure in Hinduism, and forms one of its essentials. The same may be said of the doctrine of Incarnation. Both Vishnu and the doctrine of incarnation will require from us a careful examination in a more advance stage of this enquiry. At present we are concerned with the legends only. His incarnations are ten. One Kalkin is still unborn. He is therefore the subject of a prophecy—rather than of a legend—the hope of an oppressed people rather than a dead figure in their Pantheon. Of the remaining nine, five only are Divine Manifestations in the human shape; in three others the God assumed the forms of brutes, and in one he was half-man and half-brute. Rationalizers are not wanting who see in this a foreshadowing of the modern doctrine of the Evolution of the most perfect form of life from the lowest in the manifestation of Him who, on the Pantheistic side of Hinduism, is himself the Universe. The first manifestation was that of the Fish, and this, say, is one of the lowest forms of life—one purely aquatic. The next was the Tortoise—an amphibious animal, which, though it really presents no advance upon the vertebrate organization of the fish, may easily have been thought to do so by primitive theorizers. The third is the Boar an unquestionable advance from fish and tortoise to a mammal. And the fourth is the link—the missing link which modern Evolutionists will be delighted to find, between the lower mammalia and man. He is here half-brute and half-man, the Narasinha. The fifth manifestation is human, and here the Evolutionists point out, there is gradual progress from a low type of humanity to its highest perfection. The fifth manifestation, Vamana, though human, is only an ugly dwarf, with no special gifts. The sixth Parasuram, is physically a great advance upon the dwarf. He is a powerful warrior, but there his merits end. He has no moral side. He is the murderer of his own mother, and the ruthless slayer of the whole Kshatriya race. The seventh manifests high moral qualities in addition to physical prowess. Ram Chandra is at once a model son, model husband, model brother, model friend,

a model warrior and a model ruler. But all this any ordinarily gifted human being properly educated, can attain to. Rama still wants the highest attribute of humanity—genius. This manifests itself in the crowning eighth Incarnation, Krishna. His is the genius which conquers without fighting, crushes hosts of wicked rulers by the power of human combinations alone, founds empires, on the basis of virtue and of truth and rules the whole world without even the ordinary title of a petty sovereignty. Here however the chain suddenly snaps—the gradation is lost;—for according to the Hindu view, Buddha, the ninth *Avatara* is a deluder and tempter. According to the more liberal ideas of Europe, he is however, "the wisest and greatest of the Hindus" (Rhys Davids on Buddhism).

All this is ingenious, no doubt, but unfortunately evidence is wanting to show that such an illustration of the Doctrine of Evolution —so little likely to be dreamt of by the ancient Brahmans, was the real object of the legends of the Ten Avataras. In order to arrive at the true genesis of the legend, we have to consider at what stage of Hinduism, it had its birth, and then to look for the pre-existing materials out of which it could have been shaped.

And here the inclusion of Buddha himself among the Ten is of signal service to the inquirers. The inclusion of Buddha among the Incarnations of Vishnu implies not only that the legend was posterior to the age of Buddha, but that it must have been formed at a period when the ascendancy of his religion was compelling the Brahmanas to conciliate and if possible to absorb it in their own; and this brings down the birth of the legend to comparatively modern times. It would be of course unscientific to assume that the doctrine of Vishnu's incarnation did not exist prior to the inclusion of Buddha among the Avataras. The great historical personages who are included among the Ten had no doubt from a time considerably anterior to the inclusion of Buddha in the series had taken their place in the popular estimation as Incarnations of Vishnu. These were Krishna, Rama and Parasurama, the destroyer of the Kshatriya race. A fourth Buddha was now added. These four gathered round themselves

certain pre-existing myths which had received theological expansion. The most remarkable of these is the legend of Vamana. In the *Satapatha Brahaman* Vishnu is described as Vaman or Dwarf. This probably was a development of that paradox in the Purusha Sukta, where the Purusha is described as " filling space no larger than span ". Further Vishnu is described in the hymns of the Rigveda (1. 22, 17, 1, p. 15) as making three steps. There it is nothing but pure poetry. Vishnu, the Universal Permeater is the Sun. The three steps represent his morning, his mid-day and his evening course. The poetry formulated itself in the course of time, by a process presently to be explained, into a magnificent physiolatry; and the physiolatry into polytheism. Vishnu was transformed from a Sun-God into One of the Supreme Trinity. He now represented the sustaining principle of the Universe; and his three steps covered the three Worlds, the world of the Gods (Swarga), the World of mortals (Martya), and the nether world (Patala). Bali, a pious and powerful Asura, had displaced gods and men from the dominion of Heaven and Earth. It was the Province of Vishnu, as the Regulating Principle, to readjust the condition of things. He then came down to Earth, and took the form of a Brahman Dwarf. At a great sacrifice celebrated by Bali where immense largesses were being given, the little Brahmana went to beg. His petition was most humble. Little as he was, he asked for only so much land as he could cover with three steps of his little feet. This was readily granted. The first step however covered the whole Heavens, and the second the whole Earth. Then the astonished monarch recognised Vishnu in this all-pervading Being, and things then adjusted themselves smoothly. It is impossible not to recognise in this legend the three steps of the Vedic Vishnu, transformed so as to correspond to the more modern conception of Vishnu himself.

Similarly indications exist, in regard to the Fish, the Tortoise and the Boar incarnations that these two were founded on ancient Vedic legends and grouped round Vishnu, the Preserving deity in more modern times.

The whole character of the Legends of the Incarnation of Vishnu

ought to be now clear. Great men in history had received, from the lustre of their deeds, and perhaps for even better reasons, divine honours and had been accepted by the people as incarnations of the Deity. The existence of this popular belief enabled later philosophers to give expression to a philosophical dogma. The Vedic religion had been a worship of the powers of Nature—a theory of the government of the Universe by the interposition of Supernatural Will. As culture advanced, the existence of an Order of nature, of fixed and immutable laws governing the very phenomena which hitherto had been believed to be controlled by the Will of a Supernatural Being or Beings. Even from the midst of Vedic hymns dimly shines forth the conception of a great *Rita*, binding fast the actions of gods and men*. With the rise of Scepticism the government of the Universe by law became clear and definite. The philosophers, while yielding to the spirit of orthodoxy a nominal recognition of the authority of the Vedas, studied the universe only as governed by physical and moral laws. The founder of the Nyaya philosophy announced almost in the very language employed by John Stuart more than two thousand years after him—the great law of Causation—the invariable antecedence and sequence of events as the sole possible explanation of the production of phenomena †.

In the presence of this Law, the belief in supernatural interference in the Government of the world naturally faded away as it has done in modern Europe. Orthodox Brahmana theologians had to face, two thousand years ago, the same problem which perplex orthodox Christian theologians of the present day—the reconciliation of law with interposition of Divine Will. And the orthodox Brahmana theologians two thousand years ago had recourse to the same argument to which orthodox Christian theologians have recourse at the present day. God interferes, not by suspending or modifying his laws by a fiat of his Will but by second causes, that is, by controlling one set of laws by the operation of another set. I care not to discuss how the

* See Max Muller, *Hibbert Lectures* p. 235-244.
† *Anyatha Siddhi Sunyasyaniyata Purvavarttita Karanatwam.*

argument is stated in Europe, or what is its worth. What is of importance to us is, that orthodox Brahmana theologians maintained that God interfere for the benefit of his creatures by working with the help of his own laws. And it was that he might save the world in accordance with Law that he took form as Man or Beast. It is by perfectly human means and in human ways that Rama destroyed Ravana and his race, and it was equally by human means and in human ways that Krishna destroyed Kansa and Sisupala, and built up the Empire of the Pandavas. So with Vamana, Parasuram and Buddha, and it is to be with Kalkin, the future conqueror of the Mlechchhas. Even in the lower Incarnations, where the form taken is not that of man, but beast, the same congruity with the Laws of nature is preserved. As Fish, as Tortoise, or as Boar, the Deity works out his ends in accordance with the laws of existence peculiar to those animals. The Man-Lion at first appears to offer an exception, which is explainable, and which no doubt was due to the pre-existing character of the legend into which it had to be fitted into the new theory.

The legends of the Ten incarnations, form, then a group arranged out of pre-existing materials, historical or mythical with a view to illustrate the mutual compatibility of the two theories of the Universe which have always been in conflict with each other during the progressive course of civilization. The modern Hindu, with his superior culture, may accept or reject the doctrine of such compatibility according to his light, or may accept or reject the illustrations as suitable or unsuitable. His rejection of the doctrine or of its illustrations need not take away from him his faith in Hinduism, which should rest on higher and firmer grounds than the acceptability of the legends of Hinduism.

Let us now reveiw the results to which our examination of the legends of Hinduism have led us. We have examined only a few out of a countless multitude, a few drops of water from the vast depths of an interminable ocean. It may take a life-time, and a life-time may not suffice to survey even an appreciable fraction of these bound-

less fields; no such task falls within the scope of the present work. I could deal here with a few typical instances, but I am confident that all will yield readily to the same mode of treatment. It would be presumption in me to say that I have studied all existing legends of Hinduism, or even that am acquainted with, have made their meaning clear to me. But what I can say is that all that I have diligently studied in an enquiring spirit, have been found to be intelligible.

The results then to which our brief review of Hindu legends has led is this. There are legends which are primitive nature—myths, still existing in their primitive form, or developed into a higher and more ornate character. There are again legends which are only tarditional history, more or less embellished by the art of the poet, the decorateness being often borrowed from supernatural regions. Thirdly, there are legends, which are poetry pure and simple, in the form of allegory or fable. Lastly, there are legends which are of a composite character containing within it more than one of these elements and bearing traces of manipulation by the theologian and the philosopher.

The modern Hindu may often pronounce, and pronounce with justice, that the myths are simple and uninstructive, the history unauthentic, the poetry insipid, the philosophy false theology in disguise. And if he is not led away by prejudices fostered by his European education—prejudices which habit has made in him stronger than those imbibed with his mother's milk, he will see in these legends which belong to Hinduism but do not constitute Hinduism, much that is beautiful, much that is really instructive, much that is calculated to save him yet from the effects of that deadliest of moral poison—the intense materialism of modern Europe. They serve to embellish, to beautify, to explain and to illustrate the belief of his forefathers. Left for thousands of years to form the sole occupation of an idle literary class, they have run to waste, and now form a dense impenetrable jungle in the dark recesses of which vile things grow and flourish. The way must be cleared, the rank and noxious undergrowth, and the vile things that grow and flourish beneath it must be swept away. That

should perish which is fit to perish, but do not in your anger sweep away with it that which deserves to live. Search through all the vaunted literature of Europe—rich as she is in literary treasure, and find me something which is equal to the Hindu legend of Dhruba, of Prahlad, of Savitri, the wife of Satyaban, of Harishchandra, and moderate your contempt for the wisdom of ages, and study with becoming reverence the outcome of centuries of patient thought.

CHAPTER VI

We undertook the examination of the legends of Hinduism with a view to determine what there might be in them of the fundamental principles of Hinduism. What have we found ?

We have seen that they afford in abundance illustrations of those fundamental principles, but do not contain within the principles themselves. We must seek for them elsewhere.

And from the legends let us look for them in what is intimately connected with the legends, and often furnishes the materials for their formation—and at the same time is looked upon, though quite erroneously, as the most pronounced characteristic of Hinduism. I refer to the Polytheism in Hinduism.

But before proceeding to treat of Hinduism, it may be necessary to say a few words in connection with what is generally considered to represent a prior stage in the growth of religions and which is supposed to be largely present in modern Hinduism. Fetishism is the name given in Europe to the worship of natural objects, not the powers of Nature, to the worship of stocks and stones, of rocks and rivers, of trees and serpents and other animals. It represents really a low form of religious thought, and is more or less largely characteristic of the creeds of savage nations. But it is by no means absent from India; the assailants of Hinduism equip with an apparently endless supply of arguments from this source. The European sojourner in India, under the shade of some umbrageous tree in the centre of a Hindu village, blocks of rough stone rendered hideous by copious incrustations of yellow ochre, receiving the homage of the simple residents, and sees in it a Hindu God. He sees great rivers like the Ganges held sacred, and even worshipped and sees in them a great Hindu fetish. The Tulasi plant, the Bilva tree, cows and monkeys, and even certain serpents receive a kind of homage, and lo! they are

the gods of the Hindus. The wrath of the missionary, and the contempt of his native disciple know no limit.

The worship of "stocks and stones"—of the rude blocks under the umbrageous trees besmeared with yellow ochre—Panchanandas, Manasas, Sitalas, Makals—and all the rest of the tribe may be dismissed with a single word. They do not belong to Hinduism. They have no connection whatever with Hinduism. They exist in India no doubt, but all that exists in India is not Hinduism. There is no warranty for them in the Hindu Scriptures. They are the mere remants of non-Aryan worship, surviving among Hinduised non-Aryan peoples. They are not accepted by the Hindu-community at large. The local fetish of one village finds no votary outside the local limits of his worship. The better classes of Hindus wholly reject them. It is true that the lower and uncultured strata of Hindu society still cling to these survivals of non-Aryan cults, but that is as little a ground for holding the worship of stocks and stones to belong to Hinduism as the existence of similar practices in Christian countries implies that it is a part of Christianity. That stocks and stones have been and even still are worshipped in Christian countries, will appear from the following extract from a writer who commands the respect of all.

"There are accounts of formal Christian prohibitions of stone-worship in France and in England, reaching on into the early middle ages . . . . It is remarkable to what late times pure and genuine stone-worship has survived in Europe. In certain mountain districts of Norway, up to the end of the last century, the peasants used to preserve round stones, washed them every Thursday evening (which seems to show some connection with Thor) smeared them with butter before the fire, laid them in the seat of honor on fresh straw and at certain time of the year steeped them in ale, that they might bring luck and comfort in the house*. In an account dating from 1851, the islanders of Irish Sea off Mayo are declared to have a stone carefully wrapped

* Wilson : *Primitive Inhabitants in Scandinavia*, p. 241. See also Menier, Vol. II, p. 671 (*Speaking Stones in Norway* etc.).

in flannel, which is brought out and worshipped at certain periods and when a storm rises it is supplicated to send a wreck on the coast.* No savage ever showed more clearly his treatment of a fetish as a personal being, than did these Norwegians and Irish men."

These remarks, I trust, will suffice to dispose of the general question of the existence of stone-worship in Hinduism. There are two special cases which undoubtely belong to modern Hinduism, and which apparently bear against the view here taken. I refer to the worship of the ammonite *Salagram*, and of the Phallic emblem of Siva. These in reality are [not] fetishes but idols. The word fetish is used by European writers in various senses, some, and principally Comte, giving to it a wider meaning than others. In any case, however, fetishism must be distinguished from Idolatry. I take the distinction between a fetish and an idol to be this, that while an idol is only an image or a symbol of a supernatural being who has an existence independent of the image or symbol, a fetish is itself an object embodying a supernatural being who has no existence apart from the object. In this sense, Hinduism accepts idolatry, but rejects Hinduism [*correge*: fetishism] and in this sense, Salagram and Phallic emblems are symbols, symbols of Narayana and Siva respectively, and not fetishes. At present we are not concerned with idolatry, but only with fetishism; the question of idolatry will be taken up in another chapter.

Nor will I deny that the homage paid to rivers, and specially to the Ganges, truly belongs to Hinduism. This river-worship is not a fetish-worship peculiar to the degraded Hinduism of modern times. It is as old as the Vedas. Listen to the 75th hymn in the Tenth Mandal of the Rig-Veda.

"Accept, O Ganga, Yamuna, Sarasvati, Sutudri, Parushni my praise. With the Asikni, listen O Marudvridha and with Vitasta, O Argikiya, listen with the Sushoma.†

---

* Earl of Roden: *Progress of Reformation in Ireland*, London 1851, p. 51. Sir J. E. Tennent in Notes and Queries, Feb. 7, 1852. See *Borlase*—"Antiquities of Cornwall," Oxford 1754, Bk. III. Chap. 2.

† A translation of the whole hymn will be found in Prof. Max Muller's Hibbert Lectures, p. 207. The extract given is from his translation.

The entire hymn is devoted to the invocation of rivers, which is by no means [peculiar] to this single hymn. This position taken by the great rivers of India in the physiolatry of the Vedas, shows the true character of the Hindu-river-worship. It is a part of the Hindu *Nature-Worship*. Rivers are worshipped, not as mere objects in nature, but as being among powers of nature. They take their place among Indra, Agni, Surya, Maruth, the Sky, the Fire, the Sun and the rest. If nature-worship is fetishism, Hinduism has a good deal of it, and so had the classic Paganism. But I fancy a limit must be set somewhere to this extension of the meaning of fetishism. A step further would enable us to include in it the Dualism of Zoroastrianism and of Christianity itself.

From inanimate objects let us [pass] on to the vegetable life. And at the outset we must distinguish between trees which are actually worshipped, and those which are only held sacred. The *Manasha* (Euphorbia . . .) may be taken as a type of the former; the Tulasi ( ) and the Vilva ( ) of the latter. Now it may be laid down definitely that the actual worship of trees, as that of Manasha do not belong to Hinduism. It is a relic, like the worship of stones of non-Aryan culture retained by non-Aryan tribes absorbed in Hindu community, and influencing by contact the lower strata of Hinduism. The sanctity of the *Tulasi and Vilva* does belong to Hinduism, but there is no worship in this sense of sanctity. The Tulasi is never worshipped nor the Vilva. They are merely appropriate offerings to the gods really worshipped—the Tulasi to Vishnu, the Vilva to Siva; and for this reason only, and to this extent only are they held sacred. They are not gods themselves.

Next, as to the worship of animals. Even Prof. Max Muller to whom Hinduism owes an immense debt, but whose want of acquaintance with *modern* India every one must regret, wits the modern Hindu with the worship of cows and monkey". Let us take the cows first.

We must distinguish, as has been already suggested, between a god, that is an object of worship, and a thing only held sacred. A

church or a temple is held sacred but it is not a god, not itself an object of worship. A cow is held sacred by the Hindus, but I deny that she is worshipped. The cow is held sacred for reasons which are easily understood. The cow is an animal more useful to the inhabitant of the plains of India than any other animal to the people of any other country. Not the rein-deer in its icy home,—not the camel in arid sands of the torrid zone, is so useful as the cow in the plains of India. It is the cow who ploughs the soil. The cow is almost the sole beast of burden. She is also producer of the only articles of luxury which is permitted to the Hindus as food—milk and its preparations. She is also the sole producer of that indispensible necessity of orthodox Hindu life—the Habish for the Homa. But over in addition to these, there is still another use to which the cow can be put she can be eaten. The example of our Anglo-Saxon cousins, and his Teutonic brotherhood is sufficient to convince that this is to the Aryan race perhaps the most tempting of all the forms in which the possession of the cow can be turned to account. It labours under the slight disadvantage that a cow, once eaten, can be put to no other use whatever, and any general disposition to yield to the temptation has a tendency to diminish the breed. It was necessary to protect an animal whose undiminished numbers were so serious a necessity in Hindu society by the interpolation of law, such law as then existed. So the life of the cow was declared sacred, and heavy penalties imposed upon its destruction. Nor were precepts enjoining a kind and even tender treatment of so useful an animal wanting. But there is no worship. The command here is one given by the law-givers, not the priest. Spiritual penalties are no doubt declared to be the lot of slayer of kine, but there is scarcely any temporal offence to which the ancient Hindu law does not attach some spiritual penalties. In spite of all that the cows' position in Hinduism is only that of a sacred animal that is an animal which should never be eaten, and which should be treated with kindness,—and not that of an object of worship, not a god.

The wisdom of this attachment of sanctity to the life of the cow

has made itself clear in a strange way in these days of enlightenment. It has happened that within a hundred years or so few thousand Englishmen—with of course all the Anglo-Saxon love of beef in them, have made India their residence. The Teuton's appetite for beef is something different not only in degree but almost in kind, from that of the Mussalman to whom beef is a luxury to be enjoyed on special occasions only and is of course unfettered by the restrictions as to beef which operate so powerfully on the Hindu. The result is that already the supply of live-stock in the country is felt to be inadequate to its agricultural and other wants, the impoverished cultivator feels crushed under the pressure of the enormous price of plough cattle and pack-bullocks; the supply of milk and its products so limited and therefore so high-priced as to preclude the masses from their use. As a consequence the masses depend for their nutrition upon a poor and ill-assorted vegetable diet; and ill-fed and weakly-nourished fall an easy prey to epidemics which sweep away hundreds of thousands in a single year, and have converted flourishing provinces into a desert.

And for a wise provision which provided against so serious a social calamity, is the Hindu race to be taunted and reviled alike by ignorant missionaries like Mr. Max Muller and profound Christian scholars like Max Muller? And what shall I say of that weakest of human beings, the half-educated anglicised and brutalized Bengali Babu, who congratulates himself on his capacity to dine off a plate of beef as if this act of gluttony constituted in itself unimpeachable evidence of a perfectly cultivated intellect ?

Many will meet with in Bengal, and I believe also in other provinces of India, a treatment of the cow, which the foreigner is likely to mistake for worship. Flowers and fruits are offered to the cow by Hindu females, on certain occasions; they are smeared with unguents and fanned, and invited to partake of fresh and tender grass. This is an expression of attachment, not worship. The bridegroom, the bride, a brother, an honoured guest, and others have, on occasions to be treated in the same manner. The Prince of Wales, when he visited Calcutta, was treated very much after the same fashion

by a Hindu family whom he condescended to visit. But the honour done to the Prince has happily given rise to no theories that the Heir-apparent to the throne is an object of worship to the Hindus. Possibly such theories might have cropped up in abundance, if some border district instead of the metropolis of India had been the scene of the event. The case of John Nicholson is a case in point.

I am perfectly sure that there are many things in Sanskrit literature which the Sanskrit Scholar may consider himself entitled to urge against the views here put forward in regard to the position of the Cow in Hinduism. My limits do not permit me to anticipate these, and to discuss and interpret each text in detail. I cannot repeat too often that an illiberal and obstinate adherence to literal interpretation will never enable us to arrive at the real import of the ancient Hindu writers, who love to shroud their meaning in allegory or fable or mysticism. As an illustration I will dispose of only one of the arguments, and one of the most telling, which my opponents may urge.

The cow, I say, is in Hinduism, simply an animal, and animal specially protected by law, on account of her eminent usefulness, but still an animal and not a Divine Being. My opponent can at once fling unto my face the legend of Kapila and her daughter Nandini, the far-famed cause of the great dispute between Vasistha and Viswamitra. Here at least are two cows in whose Divine nature Hinduism believes. The reply is obvious; this is a legend, and nothing but a legend. Neither Kapila, nor Nandini ever receives any worship from any Hindu, and have therefore no claim to be ranked as Hindu god or goddesses. There is a legend, and it is only a legend, it has to be interpreted in the spirit, in which, as I have already stated, the legends of true Hinduism has to be interpreted.

The meaning of this particular legend lies on the face of it. The Sanskrit "*Go*" is a name of the earth—the Greek "*Gaia*". "*Go*" however stands for Cow. A cow comes thus to represent or to symbolise the earth in the writings of those who love to shroud their meanings under the veil of ambiguous language. She is *Kapila*,

the brown. She is a *Kamadhenu,* a cow who yields milk whenever you may choose to milk her. It is descriptive of the easy productive powers of the Fertile Earth as known to the ancient Indians. *Nandini,* the Gladdener, is the produce of the soil—the offspring of Kapila. The produce of the soil, which is wealth, becomes the subject of contention between Vasistha and Viswamitra, between priest and King, just as she again was [between] the clergy and baron, between bishop and king in mediæval Europe. Nandini creates armies in her own defence—for she is the power of the purse. And the victory ultimately rests with the possessor of wealth—as it will in every social contest. The object of the legend is the glorification of agriculture, not of Zoolatry.

Next, as to monkeys. This is even a grosser mistake than the other. The monkey, as an animal is worshipped nowhere in India. The monkey is not even held sacred as the cow is.* There is a monkey-god in India—the well-known Hanuman, but he is worshipped not because he is a monkey but because he is regarded as a god or more properly a demi-god—in spite of his being a monkey. Those who accept him as a demi-god, accept him as the offspring of gods, and not because he is a monkey. He is fabled to be the son of the god Pavana, and of the goddess Anjana, and even to be an incarnation of Rudra himself.

And here again the spirit of literal interpretation has been the cause of much mischief. Rama, if he did conquer the aborigines of Southern India cannot really have done so with an army of monkeys. He must have conquered with the aid of human soldiers, though these, who are of the less cultured Dravidian races, would be contemptuously described by their haughty Aryan allies as monkeys. Hanuman was, if these views are correct, a man and a non-Aryan, and there must have been in him enough of the God-like to wrest from the haughty Aryans a recognition of the Divine in him.

* The repugnance to slay monkeys in certain cults of Vaishnavism proceeds from the reluctance to take the life of any animal whatever, not from any particular regard for monkeys. In Bengal, as elsewhere they are killed with as little repugnance as dogs or jackals.

In spite of the reverence paid to Hanuman in certain parts of Upper India, he is by no means an object of general worship among Hindus. In Bengal, as in many other parts of India, his worship is unknown, except where some solitary emigrant from the upper provinces has erected a temple to his honour. He is therefore of no interest to us, who are in search of the general and fundamental principles of Hinduism. He is one of those excrescences upon Hinduism, which we have so often to meet with, but nevertheless whom we must resolutely discard. But what more concerns us at present is that he is neither a monkey-god nor is he worshipped by reason of his simian birth. His worship is not Zoolatry, but hero-worship. And whatever may be the character of the homage accorded to him, monkeys are not worshipped in India.

There is one other phase of Animal worship that has been the subject of special study. Serpent-worship has had a range in mythology and religion; and has been traced to exist among the savage nations of America and to have existed among the cultured nations of ancient Europe. In India, the researches of archæologists and scholars have established the existence of ophiolatry in ancient times. The serpent-worshippers were however a distinct people bearing the same name as their tribal god or *totem* like the Snake Indians of America. The Puranas and Itihasas contain frequent reference to these Nãgas, who are now understood to be none other than these ancient serpent-worshippers. A Naga people still exists in Bengal, and are of non-Aryan stock. All this does not prove that there has been, or that there is now serpent-worship in modern Hinduism. To the non-Aryan worship of Manasa, I have already adverted. Though herself a plant, not a serpent, she is popularly believed to be the mother of serpents and has been indentified by her votaries with Jarat-Karee, the wife of Jarat-Karu, the progenitor of the serpent race. All this has failed to give her a place in the Hindu pantheon. She still remains outside its pale, an object of worship only in the lower strata of Hindu society in Bengal, where the non-Aryan element is larger than elsewhere. There are also in Bengal certain superstitions

connected with serpents, as there may be in other parts of India, as for instance that it is unlucky to kill a cobra which has long dwelt in the house. Such superstitions do not constitute worship.

But, as we found in place of the supposed worship of cows the legend of a Divine Cow who is not a cow but the earth, and in place of the supposed worship of monkeys a local monkey-god who is only a deified hero, so here too we find in place of serpent-worship a legend of a Divine Serpent who is not a serpent. He is as his very name *An-anta* implies, the Infinite. In the legend he is Vishnu's coach. The All-pervading Universal Being rests on the Infinite in Space and Infinite in Time. It is surprising how so transparent a metaphor can have ever been mistaken for mythology.

I doubt whether I am bound to notice such stuff as the following. "In India, the woman adores the basket which seems to bring or to hold her necessaries and offers *sacrifices to it;* as well as the rice-mill and other implements that assist in her household labours. A carpenter does the like homage to his hatchet, to his adze and other tools and likewise *offers sacrifices to them.* A Brahmana does so to the style with which he is going to write; a soldier to the arms he is to use in the field; a mason to his trowel." This passage is from Herbert Spencer's Study of Sociology, (1. p. 309). The italics are mine. The passage serves to show to what nonsense even writers like Mr. Herbert Spencer will give currency on subjects with which they have no personal acquaintance. Take again a more competent authority. "Not only does the husbandman" says Sir Alfred Lyall, in his Religion of an Indian Province, "pray to his plough, the fisher to his net, the weaver to his loom, but the scribe adores his pen, and the banker his account books." This reminds me of a *Khidmutgar* in the employ of one of Sir Alfred's countrymen resident in India, who saw his master say grace before commencing his repast, and came to the conclusion that his master worshipped the food he ate. Professor Max Muller quotes both these passage in a note to his Hibbert Lectures, and very pertinently asks, "What is meant here by adoring?"

Enough has been said to show that Fetish-worship does not belong to Hinduism, and if the worship of stocks and stones is to be found among lower strata of Hindu society, it is the duty of the better educated Hindus resolutely to set his face against it, and to put it out of the pale of Hinduism. It is a relic of non-Aryan barbarism.

CHAPTER 1

POLYTHEISM—FIRST STAGE

I have denied that there is any fetish-worship in Hinduism, but I must admit that Polytheism is one of its distinguishing features. So strong are the prejudices of educated natives of India, derived from the still stronger prejudices of their Christian teachers that I can well imagine them hanging down their heads in shame and sorrow at this confession. Polytheism is with the Christian and therefore to his intellectual progeny in India a word of reproach—a sign of low culture and mental imbecility, the parent of all evil, and the cause of eternal damnation. The prejudice is originally Jewish, and handed down to Christianity with the Judaism which it has absorbed. The Jews were a fanatical [race] of low culture, and it is unfortunate that Judaic narrowness should still rule the world through its Christian teachers. And all this in spite of the fact, that Christianity, with its vaunted monotheism, is really a polytheistic religion with its Triple God, its hosts of angels, saints and Devils. A pure monotheism is not to be found among the most cultured nations of the earth. It did not exist in ancient Greece, and it does not exist in modern. If it is found at all, it will be found in spheres of lower culture, among Mohammedans for instance.

And what is the higher ground which monotheism is believed to occupy with reference to Polytheism. Why is a pure monotheism, freed from all polytheism, a rational worship, and polytheism mere stupidity and folly ? What evidence is there, that God is One and cannot be many ? That the government of the Universe unlike that of society, is carried on by a single Personal Being, without the intervention of others ? If you come to the question of evidence, evidence in the same sense, in which you require, evidence before

you can accept a physical truth as established, there is probably as little in favour of monotheism as of Polytheism. Everything, you say, points to a First Cause. Granted, but does the existence of a First Cause disprove the existence of Second Causes? You may point to the unity of Design apparent in nature, as indicative of a single Designer, if a designer there was. Will you infer from the unity of design apparent in a building that it was the work of a sole architect, who had no masons or labourers to co-operate with him? You may reply that He could not have been in need of assistance, as He is Omnipotent. Do you not see that you assume this attribute of Omnipotence? There is no evidence in Nature that its author was omnipotent.

All this however is beside our main purpose and is intended to meet the bigotry of those who shudder at the name of Polytheism. I do believe that there is one God, and Hinduism does not accept more than one God. Hinduism is a monotheistic religion, in spite of its polytheism and does not suppose the existence of a number of deities subordinate to or co-ordinate with the Great Author and Ruler of the Universe. What then is the Polytheism which is also to exist in Hinduism? Let us now enter into an examination of it. It will be a long and difficult task.

And, first of all, we must distinguish between the two phases of polytheism, which we find in Hinduism. One is the Vedic polytheism, the other later Pauranic Polytheism. The later is a superstructure upon the former. The Vedic Polytheism has been modified, and built upon, but nevertheless exists at the present by side with the later developments.

The Vedic polytheism has been thoroughly studied in Europe and is better understood there than anything else relating to Hinduism. Here at least the reader may accept the European interpretation, for there is no study which does not yield its secrets to the European scholar when he takes it up seriously and earnestly, divesting himself of his prejudices. There are good reasons why I should describe the Vedic Polytheism in the language of European scholars than in

my own. And first let the reader take the following somewhat superficial but practical summary of it by Mr. Monier Williams. "They (the Vedic Aryans) worshipped" says he, "those physical forces before which all nations, if guided solely by the light of nature, have in the early period of their life instinctively bowed down, and before which even the more civilized and enlightened have always been compelled to bend in awe and reverence, if not in adoration. Their religion was what may be called in one word physiolatry." (Hinduism, p. 21)

Professor Max Muller's explanation of course goes deeper. He described the old Vedic Religion as being "a belief and worship of those single objects whether semi-tangible or intangible, in which man first suspected the presence of the invisible and the infinite, each of which was raised into something more than finite, more than natural, more than conceivable; and thus grew in the end to be an Asura (From *As* to breathe), or a living thing, a Deva (From *Div* to shine), or a bright being; an *Amartya* that is not a mortal, and at last as an immortal and eternal being ;—in fact a god endowed with the highest qualities which the human intellect could conceive at the various stages of its own growth.

The natural history of such a religion is of uncommon interest as a scientific study but need not detain us. It is a growth peculiar to India. The powers of nature have been deified and worshipped wherever in the world a certain advance has been made in religious ideas. There have been, or are, a multitude of nations in various stages of culture who have worshipped a Sun God, or (the Sun as a god), a Moon God, and Earth Goddess, a Heaven God (Varuna), a Rain God or a Thunder God (Indra), a Fire God (Agni), a Wind God (Vayu), a Storm God (Maruths) and so on. It is sufficient for our purpose what the true significance of this Vedic Polytheism is. It is nature-worship, corresponding to the nature-worship in classic paganism. The Deities of the Vedic pantheon are not gods, but merely the powers and forces of nature conceived as such. Now what is the value of such a religion? Is it entitled to retain its place

in the religion of the nation, or should it not be discarded as false worship ? For there is no question that Hinduism must be prepared to discard whatever is not true worship.

"The words Religion and Worship," says Professor Seeley, "are commonly and conveniently appropriated to the feelings with which we regard God. But those feelings, love, awe, admiration which together make up worship, are felt in various combinations for human beings, and even for inanimate objects. It is not exclusively but only *par excellence* that religion is directed towards God.

Now, it is surely not to be supposed that every higher form of religion ought to supersede and drive out the lower forms .... Feelings of admiration and devotion are of various degrees, and are excited by various objects."

Among these various objects are the mighty forces and great powers of nature. And why should the worship of God crush out the worship of that which as great and mighty and awful, is entitled to worship, though in a lower degree. Why do we worship God ? Not that He, like some worldly despot, requires from us acknowledgment of his Power and Greatness. Worship is a means to Culture as an end, and we worship Him, because to worship Him is to promote our Culture. And is not the worship of the Grand and Beautiful in nature Culture also ? If nature is god, the worship of nature is worship of god also. If God is apart from Nature, even then the adoration paid to his work is adoration paid to him.

I have said that Religion in its broadest and most legitimate sense is Culture. If this be true, the most perfect religion is that which supplies a basis for the most complete development of Culture. It follows from this that no religion which refuses to recognize the highest possible Ideal in a perfect personal Being, like the religion of Humanity, can be a perfect religion. Nor can a religion which does not comprehend in it a religion of Humanity, as both Christianity and Hinduism undoubtedly do, be a perfect religion, for the perfection of our moral feelings, depend in a large measure upon our conduct towards fellow men. For the same, a religion which excludes

nature worship is an imperfect religion. Experience has shown that the absence of this element from a religion, as in Christianity and Mohammedanism, serves to develop narrowness and bigotry, and to harden this sterner virtues into cruelty and fanaticism. Hinduism alone contains within it all these elements of worship,—Hinduism alone therefore is a perfect religion.

But in order that the worship of nature may have its legitimate effect on the culture of the feelings, it must always be kept in view that the worship is of the powers and forces of nature only, and not that of Supernatural Beings possessed of Intelligence and Will. That Hinduism in its days of corruption lost sight of this important truth, is unquestionable; and it is the duty of the cultivated modern Hindu to restore to its primitive purity. This is by no means a difficult work. Though recognised as gods, possessed of intelligence and will, the Vedic deities can hardly be said to be worshipped at the present day. With the exception of the Sun, they receive no sacrifices specially intended for them and rarely do we meet with modern temples erected to their honor. Even the worship of the Sun himself is fast dying out. What is wanted is, that the national mind should be educated to a perception of the true character of the Vedic Gods.

These remarks apply only to the earlier or Vedic Polytheism—or rather to so much of it as still survives in the popular religion. We have not yet referred to the later or Pauranic Polytheism, and before we can make an attempt to understand it, we must briefly notice the intermediate developments of Hinduism.

CHAPTER. . . .

As culture advances polytheism must lose its ground. Exprience discloses that the universe is governed by fixed, unchanging laws. Certain physical effects follow, it is seen, whenever certain physical antecedents are present. And if physical causes suffice for the invariable production of effects, there is no room for the supposition of a number of Supernatural Intelligences for the production of phenomena hushed to its furthest consequences, as the student of science has done in these days, the last conclusion from this conception of Law as sufficient for the production of all phenomena is the denial, or rather the non-affirmation of all Supernatural intelligence. Science while recognizing a vast and infinite energy pervading all Nature, refuses to recognise a personal God. This is the only conclusion which modern science will accept ; it is however generally a vast stride for the earliest sceptical philosophy to achieve. Vast as the progress is the Hindu philosophers did achieve it, and that at a bound as we shall presently see, but they were unable to carry the people wth them. And this was the cause, why the revolt against the Vedic polytheism, instead of forming the later religion into a simple and homogeneous monotheism like Mohammedanism led to the development of immense complicated system, embracing within it every variety of belief, monotheism, pantheism, even atheism, and ultimately to that highly elaborated eclectic religion which absorbed them, and which is modern Hinduism.

Now let us stop to see what were the conclusions to which the early scepticism, the first conception of Law, drive a polytheistic but highly gifted people.

How does the conception of Law dislodge the polytheistic deities from their place in the national worship ? Let us take an illustration. There is the moon. It is found, that at intervals which are to the primitive observer uncertain or capricious, she is what is now known

as being "eclipsed." In accordance with the then prevalent mood of accounting for phenomena, the eclipse is attributed to an effort, an act of a pure supernatural Being. There are a couple of malignant Demons, Rahu and Ketu who make an attempt to devour the moon on account of an early grudge. Not only therefore is the moon—the measurer, an Intelligent Supernatural Being herself—that she was long ago as soon as according to the necessities of language she was named the "measurer," but her eclipses give rise to the existence of to other mythological beings. In course of time science ascertains that these eclipses are perfectly calculable and occur at periods which are governed by law and not by Demoniac Caprice. They are found to depend on the motions of the heavenly bodies and not on either the malignance or the gastronomic powers of fiends. Rahu and Ketu still retain their place as the ascending and descending nodes in Astronomy, but cease to be demons.

Now arises a vast question—at once the loftiest and the most insoluble problem which man has had to answer. The eclipses are due, it is seen, not to malevolent demons, but to the revolutions of the Heavenly bodies. But why should the Haevenly bodies be moving in this fashion ? Do they move at their own pleasure revolve round and round because they choose to do so? No—this cannot be, for they too move, it is seen, not capriciously not at their own pleasure but according to fixed and unchanging Laws. How was it that they became subject to law? Who impose it on them? Who made these laws? Did some one make them, or are they self-existent ?

This is the great problem which at the first birth of scepticism presses upon the enquirer for a solution. There may be three different answers :

(1) One is, that they cannot be self-existent. There is nothing which, according to our lights, is self-existent. Every effect has a cause. In the endless claim of cause and effect we never came across an effect which never had a cause. The Law of Causation endures through the whole province of human experience. And shall we

conclude that this vast universe alone is without a Cause ? Has cause after cause sprung into existence without a First Cause ? Everywhere we meet with the handiwork of a Great Authority of the Universe. Acknowledge him then as the Great Father and ruler of the Universe. This is monotheism, pure and simple. Modern science declares the reasoning neither conclusive, nor tenable.

(2) The second answer is that of Auguste Comte and his disciples. We know nothing of an Author of the Universe. We know that the universe exists, and that it is governed by laws. Beyond those laws we know nothing and can know nothing. Laws may be self-existent for aught we know. We do not know that they are otherwise. There is a modification of this line of thought which is fast losing its ground in the modern world, but which was formulated with wonderful power of logic by the author of the *Sankhya Pravachana Sutras.* Not only do we not know that God exists, but he cannot exist. This alone strictly speaking, is Atheism.

(3) The third answer seeks to reconcile the other two. It grants that there may be a first cause, and it admits Nature and her laws, of not exactly to be self-existent, but to what very nearly amounts to the same thing. Granted, there is a First Cause, but why should we seek it beyond Nature. Is it impossible that the cause of the universe should be in itself! God, it says, is in Nature; and all phenomena his manifestations. This is Pantheism.

In the early revolt of Hindu philosophy against the Vedic Polytheism, all these lines of thought expression led to some of the most momentous revolutions in the destiny of the human race. The geratest of these, the rise of Buddhism was the outcome of an Atheistic —a Religion of Humanity, which like the modern religion of Humanity, recognised no God. The Sankhya too, as originally propounded by its great founder, was atheistic. But in the hands of its later expounders it acknowledged a God, and then in its time, reached with remarkable force and power to the National conception of the Divine Being. But Atheism disappeared out of Hinduism.

Pantheism and if that conception of the great universal Principle

to which science alone is inclined to pay much respect occupies a large area in Hinduism. It is the earliest product of the revolt against polytheism. It is present in the Vedas themselves. It is the leading thought which finds expression in the Upanishads. It is by no means rare even in the hymns of the Rig-Veda. The celebrated Purush Sukta is a pantheistic hymn. It has attracted to itself the largest amount of literary talent and theological. The great Uttar Mimamsa School of philosophy is devoted to its exposition. One of the greatest figures in Indian philosophies—Sankaracharya developed it, embellished it, and preached it with an amount of learning and eloquence unrivalled in India. If there is any religious book in India, which to large numbers of worshippers, is what the Bible is to the Christian, is the Bhagabata Puran. If there is any philosophical poem in Sanskrit, which is worth more than the whole of the profess religious writing, it is the Bhagabata Gita. Both these great works—among the greatest in Indian literature—drive their philosophy in spite of their eclecticism mainly from the Vedanta. There is nothing in Europe equal in richness or in splendour to the pantheistic literature of India.

All this and much more has led scholars both European and native to believe that the higher Hinduism, if not the popular Hinduism also, is pantheistic. This is in a certain measure true, but such an opinion excludes from consideration the later and final developments of pantheism in India. The god of patheism is too abstract and philosophical a conception to form the basis of a popular creed; and when it does get mixed up with a popular creed, begins to exercise a controlling influence upon it and is finally accepted by it, as was undoubtedly the case with pantheism in India, it itself undergoes a remarkable transformation. The popular mind instinctively forms of the god in nature the only conception of such a Being which it finds within the reach of its powers, *viz.* that of Personal Being, who though pervading all Nature, has his own individuality, and therefore attributes which are distinct from those of the Nature which he pervades. Thus from the original pantheistic conception of Narayana, or God in Nature, arises that of Vishnu, the universal Pervader, who has his

individually apart from the universe. But the great question is why should their be such a transformation.

First, there is the ancient but somewhat unphilosophic explanation —anthropomorphism. In certain stages of culture the worshipper cannot form the object of his worship except after his own model. The Vedic dieties whom Projapati, Brahman (Creator), Atman had displaced, or were displaced, were all gods formed after the human pattern. The Hindu mind had been accustomed to conceive of all supernatural Beings—even Indra and Varuna, as possessing attributes the same in kind with theirs however vast their superiority in power and excellence. The more abstruse conception of a god in nature, when presented to the popular mind, naturally formed itself there in the same mould. From an impersonal Soul, of Nature, he became a person, the Creator, the Preserver and the Destroyer of nature.

The explanation is by no means worthless, and will often pass as sufficient. But Religion would be a thing of infinitely less value than I conceive it to be, if its development had nothing higher to disclose than the weakness of the Human Intellect. The highest excellence which the human faculties are capable of recognising is moral excellence. The highest Beauty which man can love or admire is moral Beauty. The highest form of existence is moral Existence. The most exalted worship is the worship of moral Perfection. The worship of the god of Pantheism—of pure Pantheism such as is known in Europe—is devoid of this element, the most exalted and vivifying element in Religion. In an Impersonal God who is simply the great Principle of Nature, we can recognise no moral attributes to which we can render worship. His worship is a barren and purely intellectual worship which crushes the heart by the unallowed sense of power and greatness which we contemplate, but which we can neither love nor set up as an Ideal from which to derive our own Rule of life. Pantheism therefore fails as a Religion. Moral attributes implies Personality. We must worship a Personal God in order that we may worship the highest form of Excellence—that our worship may not be a barren and crushing worship of Power and Pitilessness, but one

of Love and Hope, and an exalting influence leading man to the highest Ideal of life.

The belief in a Personal God is not only a moral, but when the belief in the existence of God is once accepted, also an intellectual necessity of human nature. "We believe in the existence of an Infinite God" says Mr. Mansel, "and we know also that we cannot conceive Him as Infinite. Our conception of the Deity is still bounded by the conditions which bound all human Knowledge, and therefore cannot represent the Deity as he is, but only as he appears to us." Our conception of God therefore casts itself into an anthropomorphistic mould and assumed a Personality in which alone he can be conceivable to us.

I can conceive that doubts will be cast by the learned on the existence of a personal Supreme God in Hinduism. It will readily be admitted that there is on the one hand the belief in a Pantheistic God —the God in Nature of Science and the Iswara of the Hindu systems of Philosophy, and there is on the other the mythological conception of a Trinity discharging, each in his own sphere, the several functions of a supreme Personal God, but neither of these beliefs is a belief in a Personal God. Such contention would beside the purpose, for all who are personally acquainted with popular Hinduism as professed by the people at large know that the belief in a Personal God is of the very essence of the creed of the Hindu peoples. The words "Iswara," "Parameswar," "Jadadiswar" are on the lips of every Hindu and are used by them to denote not the philosophic conception of a Pantheistic, but a Personal Ruler of the universe, and the Supreme Disposer of all things. Even in the systems of Philosophy specially in their later developments, Iswara, as the First Cause, gradually gathers around him attributes which are only the very attributes of a Personal Being. In those great store-houses of the traditional religion of the Hindus, the Itihasas and Puranas, this belief in a Personal God co-exists with that in Impersonal God co-extensive with the universe on the one side, and Tritheism and Polytheism on the other. Duryodhan in the Mahabharat . . .

DEVI CHOWDHURANI

On rushed the vessel in the dark, parting the gathering masses of foam at the prow. The wind roared, the clouds thundered, the lightning flashed, the rain fell in torrents and on rushed the vessel, steady as in the serenest weather.

Brajeswar and Ranga Raj now released the lieutenant.

"Be seated comfortably, sir," said Ranga Raj, "the Rani probably will do no harm. But you should not have boarded Debi Rani's vessel without her permission. Have you never heard that she is a goddess Incarnate? But how was it Sir, if I may put the question, that you neglected to cut down our masts and destroy our sails, when you saw the clouds gathering in the heaven."

"I never thought," replied the lieutenant, "that you would venture on such navigation as this. A sea-going vessel in the open seas may venture on such a course with impunity but to sail in the dark in these narrow rivers, abounding in shoals and sand-banks, and before such a fearful driving tempest—I have never seen or heard anything like it in the Bengal rivers. You are all in danger of your lives every moment."

"Not at all," replied Ranga Raj, "these rivers are so familiar to us that we can navigate them with our eyes closed. The man at the helm is the first steersman in these rivers."

The lieutenant paid little heed to Ranga Raj's conversation; he felt sorely vexed at having been outwitted by a woman. Ranga Raj finding him gloomy and taciturn, went out on the deck, and carefully watched the progress of the vessel. Brajeswar who wished to avoid

being accosted by his father had quietly glided away unobserved by him but instead of going out, like Rangaraj to the deck, he had glided into the next apartment, where he knew Prafulla was.

Haraballav's condition at the time allowed him to bestow little attention on his son's movements. The rushing of the storm while he was yet floating on the unstable element of water, had stupified him. Then when he actually found the vessel part its moorings, and reel before the heavy gusts of wind, he lost at once both physical and mental equilibrium and found himself stretched at length at Nisi's feet. Not exactly comprehending whether he was on the surface of the Teesta or at its bottom, he was discussing within himself whether there was any further use in calling on Durga to save him. A suppressed laugh from Nisi convinced him that probably he was not at the bottom, as he had never heard of any one indulging in laughter in those regions. So he mustered courage, tried to sit up and found that there was nothing to prevent his doing so. Nisi now took him in hand. "Would you like to sleep sir ?" said she.

"This is not the time for sleep", said he.

"You will never find any other", replied Nisi meaningly.

"What do you mean ?" asked Haraballav timidly.

"You came here as a spy who was to deliver our Debi Rani to the English."

"No—yes—you see—" stammered Haraballav.

"Do you know what the consequences would have been to Debi if you had succeeded ?"

"You see—I do not know—that is—" again stammered the cowardly wretch.

"She would have been hanged. She had done you no harm. On the contrary, she did you an infinite deal of good—remember the fifty thousand rupees. And in grateful recognition of this service, you wanted to get her hanged. Do you know what punishment is meet for you ?"

Haraballav had not the power to answer.

"Therefore, I say", continued Nisi, mercilessly, "sleep now,

if you wish to sleep. For you will never see night again. Do you know where we are going ? "

Haraballav spoke not.

" There is a melancholy burning ground " continued Nisi, " called the Witch's burning ground. Those whom we want to kill, we take there and kill. We are going there now. The Saheb will be hanged, so the Rani has ordered. Do you know what punishment is reserved for you ? You will be impealed alive. "

Haraballav clasped his hands and cried like a child; " Save me, save me! " he called out.

" Do not cry you coward " thundered the lieutenant—" you are old—why cannot you make up your mind to die ? "

The roaring tempest prevented the sound being carried to Brajeswar's ears or Nisi's plans might not have proceeded so smoothly.

" Save me! Can no one save me " cried the coward still.

" Who is so base as to interfere on behalf of a wretch like you ? The Rani I know is merciful—but no one shall seek mercy for you. "

" I shall give you a lakh of rupees " said Haraballav, " if you can save me. "

" Is there no shame in you " continued the pitiless Nisi, " for half that sum, you have turned the basest informer. And dare you speak of lakhs ? "

" I will do whatever you may command me to do " groaned Haraballav piteously.

" People like you can do nothing which is worth being done, " replied Nisi contemptuously.

" The meanest, " groaned the wretch again, "may be of use. Command I beseech you—I will do your biding. Do but save me."

" And supposing you can be of service to me, " said Nisi in reply, softening her tone a little, " what trust can I put in you ? You have shown yourself a rogue, a coward, and ungrateful wretch, and an informer. Can I trust you ? "

" I will take any oath you prescribe " was the eager reply.

"Your oath!" ejaculated Nisi, contemptously, "how will you swear?"

"By the Ganga Water, Copper and the Tulsi plant."

"No" said Nisi, "can you swear by your son?"

For once Haraballav flashed up. "*That* I will not" said he with energy; "you are welcome to kill me in what way you like."

"Let us dispense with oath then" said Nisi vanquished for once.

"They are not worth much from you, and as you are in our power they are unnecessary. Do you wish to live?"

"Yes—yes—save me!" was the piteous reply once more.

"Well then listen" said Nisi, "my father is a great Kulin. It is hard to find husband for daughters of our exalted line. We are restricted to only one clan, as you know, *viz.*, that which you belong. I am married, but I have a sister who has not been—because none of your clan has been found willing to take her. The objection is that she is past the marriageable age. She is now twenty-five or so. Now if we cannot get her married to one of your clan, my father loses caste. Will you save us from the terrible fate?"

Haraballava felt overjoyed—felt restored to life from the most horrible of deaths. Only another marriage. That was a light affair for a Kulin Brahman. As to the bride's age, even that was nothing very uncommon in the case of Kulin marriages. The reply he gave was exactly what Nisi had calculated upon.

"This is not a great matter. It is the duty of the Kulin to save other Kulins from such misfortune as you anticipate. As to the bride's age, why I have seen brides given away at the hoary age of seventy. There is only one thing. I am myself too old to marry—will not my son suit you?"

"He may not be willing to marry" objected Nisi artfully.

"My will is his will—he has never yet disobeyed me," said Haraballav.

"But I wonder how he came here tonight. Do you know?" asked he, quite at his ease now.

" He came here to seek you " said the inventive Nisi who never objected to smack jokes.

" Where is he now ? " asked Haraballav.

" He is quite safe—you shall see him in the morning. Will you make him consent to the marriage ? If so, we will let you depart in peace. "

" Most willingly " replied Haraballav. " Do go and obtain my pardon from Rani. "

" Look upon it as settled. " She then went to Debi, followed by Diva.

" Nisi has been carrying on a wispered conversation with your father-in-law," said Diva maliciously to Prafulla.

" What about " enquired Prafulla of Nisi.

" Negotiating a marriage " answered Nisi, " would you like me to be your mother-in-law? "

" Krishna forgotten, I see " said Prafulla laughing, certain that Nisi has not been negotiating her own marriage.

CHAPTER . . .

The tempest subsided into a calm. Prafulla ordered her vessel to be unclosed. When morning broke, she gave her instructions for the disposal of prisoners.

"Let Rangaraj see them honourably dismissed. Let him provide my father-in-law with a conveyance to take him home; palki (a native conveyance borne by men) and bearers must be procurable in some adjoining village. Let the Saheb be provided with the expenses of his journey back to Rangpur. Tell him also that should any of his men have been wounded in yesterday's fray—he should instruct them to come to us; I will make them such compensation as money can give. Should any have died I shall make some atonement by providing for their children."

Nisi nodded assent, but unknown to Prafulla added some suggestion of her when communicating them to Ranga Raj. She then suggested to Haraballabh, that it was time for his morning ablutions and prayer, and he was at liberty to get on shore but he must go in charge of a Barkandaz. At the same time somewhat obtentatiously called on Ranga Raj to take the Saheb to the Witch's Burial ground, and there hang him by the neck.

It was therefore with a heavy heart and much misgiving that Haraballabh went down to the beach to say his prayers in charge of a fierce-looking Barkandaz. While engaged in performing his ablutions, he saw the lieutenant march passed him, accompanied by Rangaraj and a Barkandaz.

"Where is the Saheb going" asked Haraballabh of the escort timidly.

"To the gallows" replied Ranga Raj curtly.

Haraballabh trembled for himself. He forgot his prayers and hastened back to Nisi to ascertain the result of her interference

on his behalf. Rangaraj however did not lead lieutenant Brennan to the gallows. He accompanied him to the nearest village, purchased a horse for him with Debi's money, provided him with funds for his journey, delivered him Debi's message, and then courteously bade him farewell. The lieutenant doubted very much in his mind whether these were robbers at all.

Haraballabh on his return, found his reception somewhat different from what he had anticipated. A tempting repast consisting of fruits and sweets of various kinds, waited for him. Nisi pressed him to the refreshment with a courtesy and gentleness which contrasted strangely with pitiless scorn with which he had tormented him the previous night: She reminded him significantly of the promise he had given her the previous night, and said that Brajaeswar would be presently before him to receive his instruction. Brajeswar who had gone on shore for a stroll, shortly returned and found his father agreeably employed in trying the favour of sundry nuts, pomegranates and other fruits. On seeing Brajeswar Haraballabh who was certain that he was being watched spoke to him in guarded language.

"I have not learnt, Brajeswar, how it happened that you were here yesterday," said he, "but this I can hear from you at leisure when we are at home. I understand that you came here to seek me, and I do not see that you are under any sort of restraint or in any troubles. Are you ?"

"None whatever, Sir," replied Brajeswar.

"That is good" resumed his father, "now I find myself hard-pressed on a matter in which I have not been able to give a refusal."

Haraballabh then briefly explained to Brajeswar Nisi's request, which certainly took him very much by surprise. "I have given her a sort of consent," said he, "and should you find the family of good caste, and otherwise free from reproach I see no objection to the course proposed. It would be not only rescuing a family in distress, but would also go to meet your mother's and my own wishes to a certain

extent as we have both been anxious to see you suitably married again. You can ascertain the further detail from the lady whose sister the bride is and if you find nothing to object, you can contract the marriage and bring the bride home. I will return home at once provided I can find a boat or other conveyance."

"A palki and its bearers are waiting for you sir," said Brajeswar.

This was true, Rangaraj had procured them for him under Debi's orders. Haraballav lost no time in starting him, glad to get out of the reach of the women, who had threatened to put him to a very disagreeable end. That he should leave his son in their hands made him somewhat uncomfortable, but consoled himself with the reflection that his son was young and handsome and evidently in good graces of the dreadful women. A handsome face thought he vanquishes the fiercest of them.

"What is the farce about, lady...?" asked Brajeswar of Nisi, when his father was gone.

"Why, truly you are more stupid than the men generally are. Do you not see, you are to marry my sister and to take her to your father's home?"

"Where is your sister, pray, and why am I to marry her?" asked Brajeswar.

"Here is my sister" replied Nisi, dragging Prafulla forward by the hand; "as to why you should marry her, is a question which you had better settled with her."

They now all comprehended Nisi's clever trick upon Haraballav but it did not produce the joyful effect she had anticipated. Both Profulla and Brajeswar looked grave, while Diba began to whimper at the idea of being separated from Prafulla.

"Your plan will not answer lady..." answered Brajeswar. "I must not deceive my father. If I take Prafulla to my father's house I must tell him who she really is."

"Did I not say that you are more stupid than even the rest of of your sex?" replied Nisi, sorely vexed, "what will your father

say when he learns that his new daughter-in-law is no other than the famous robber Debi Chowdhurani ? "

"Let Debi's name be never mentioned among us again" said Prafulla earnestly—" I have done with that life for ever. Wherever I live now, I shall now live as Prafulla and die as Prafulla."

"Will Haraballav Ray, think you, be more tender towards Prafulla than towards Debi ?" asked Debi with some bitterness.

"It is a matter," said Brajeswar, "which you had best leave me to settle, when I spoke to Prafulla last evening, I asked her to accompany me home. I make the same request again—I beg it of her. Should she consent, the rest is my business."

"Do not get angry, friend Brajeswar," said Nisi sweetly. "It is your business, but are you sure you will not mar it as you did ten years ago."

"Ten years make a great difference in a young man's life." said Brajeswar.

So it was settled. Brajeswar's plan of course was preferred to Nisi's. As Prafulla had just said, Debi was no more. She had disappeared from the theatre of the world for ever.

CHAPTER...

And now Prafulla began her preparation for the journey to Bhutnath. The first step was to break the matter to the faithful and devoted Ranga Raj. The task of explaining the matter fell upon Nisi. She performed it well and faithfully. Rangaraj wept at the thought of parting with his mistress and for a time insisted on misbelieving Nisi's story. Prafulla then herself addressed, in kind and affectionate language and exhorted him to follow her example. She commissioned him to disband her soldiers and the numerous attendants male and female, who generally as now, resided at her headquarters at Debigar. At this place which Ranga Raj had named after her, Bhavani Pathak had caused a magnificene palace to be erected for her to which Debi had added a magnificently. Though she rarely lived there, Debigar formed her headquarters—where was kept the bulk of her treasure, all that part of her moveable property which she did not keep in her boat, and where were collected the majority of her servants and retainers. All this, with certain reservations made in favour of Nisi and Diba, Prafulla gave away to Ranga Raj, on the condition that Ranga Raj was to devote all that remained after satisfying his necessities to the relief of distress. Then s-he addressed him as follows :

" Go and live there; may the gods preserve you ! You will never be in want. Never touch the sword or the musket again. That which you and Bhavani Pathak consider to be doing good is really great and fearful brute forces. It is for God in heaven, and the King on earth to punish the wicked. No one has deligated to you or to me that duty. Do good by all means, but do it by means which the holy Sastras prescribe. Above all be faithful to God. Tell Bhavani Thakur that I shall die content if I ever hear that he has taken to the ways of peace. "

Ranga Raj left her there with his Barkandazs. Nisi and Diba would not leave Prafulla still she reached Bhutnath, wither they all proceeded in the great big boat. That boat so welknown as the residence of the Robber Princess was to be destroyed after it had reconveyed Nisi and Diba to Debigar. All the valuable properties it then contained— gold and jewels and other valuables in abundance, as the reader has seen—were to become thenceforth the joint property of Nisi and Diba, to be devoted by them to charitable purposes. So strictly was Prafulla bent in redeeming her pledge to Krishna that she was determined not to take with her to her husband's house anything beyond the cloth she wore.

" And sister, you contemplate entering your husband's house unadorned " asked Nisi.

' A wife by the side of her husband " replied Prafulla " stands in no need of ornaments. "

" Accept my last service then—on the last day we stand together, " said Nisi, " allow a sister to decorate a sister in her own humble way. "

So saying Nisi adorned Prafulla with the splendid set of jewels she had received as a present from the Raja, as the reader may remember. She had had no occasion to use them till now.

And now all serious business being done, the three ladies gave way to tears at the sorrow of parting. Diba of course set the example. The tears they shed were genuine; for as the reader has seen, they sincerely loved each other.

At length they reached Bhutnath. Prafulla took the dust of Nisi and Diba's feet, and bade them farewell, with streaming eyes. The great big boat started for Debigar with Nisi and Diba in it. Being at Debigar they discharged the crew, and destroyed the vessel. They settled down into a quite life, worshipping Krishna in the great temple there.

CHAPTER...

Haraballav had on his return home informed his household that Brajeswar might soon be expected back with a new bride in his company. He had been obliged to add that the bride in this case is not a little child, but a fullgrown woman. The circumstance, though not absolutely rare, was not of frequent occurrence, and created considerable excitement not only within Haraballav's household, but throughout the village.

No sooner therefore then Debi's great big boat touched the land at Bhutnath, than the news ran like wild fire throughout the village that Brajeswar had brought a great big bride in a great big boat. The arrival of a newly married bride is always an event in a Bengal village. But the excitement on this occasion was extraordinary. Old and young, the maimed and the half-clad flew to Haraballav's old and weather-beaten dwelling to see the bride and it was amidst an immense throng of curious spectators that Brajeswar's mother stood out to receive the new daughter-in-law into her household. It is usual, at this stage, for the lady of the house to go through certain ceremonial forms indicative of affection towards the new daughter-in-law. One of them is called the *Varana*. During the Varana the bride stands veiled by the side of her husband. The lady of the house lifts the veil from the face to judge of the loveliness or otherwise of her face—for beauty is generally, in the eyes of the feminine portion of the Bengali population, the highest perfection which a bride can possess. With a thick veil drawn over her face Prafulla stood by her husband's side, according to custom.. The *Ginny* gently lifted up the veil to see her face; she slightly started as she saw that lovely face, and dropped the veil rather abruptly. "Lovely face!" said she, but she said nothing more. A tear stood in her eyes.

The assembled multitude of course clamoured for a sight of the lovely face, and many an old crone was prepared to lay violent hands on the bride and see what sort of a face it was that the thick veil covered. The *Ginny's* tact however speedily put them to flight.

" Mothers! " said she, " my son and his bride have had to make a long journey to come here. They must be weary, hungry and thirsty. Go home now. Come back when we shall be all more comfortable. My daughter-in-law of course will live in my house. You can come and see her as often as you like "

This speech was of course eminently repulsive without being rude, and the assembled neighbours, highly incensed at the *Ginny's* conduct, began to disperse. Many were the unfavourable remarks made on her conduct, not only on this, but on previous occasions. The bride was mercilessly criticised. She was of course a terribly big woman for any one to marry. It was surmised that her years were probably on the wrong side of fifty. It was agreed without a single dissentient voice that she was horribly ugly; that was, it was concluded, the cause of the *Ginny's* reluctance to disclose her features to the public gaze. Brajeswar came in for his share—he must have been utterly demented to marry such a fright. The bride, it was finally concluded, was probably a goblin or a Dakini, (a witch) who had bewitched him. No one offering seriously to contest these views, they gradually died out for want of opposition; and as darkness fell upon the village it peacefully went to sleep.

After the crowd had dispersed, and the clamour had subsided, at least within the household, the *Ginny* took Brajeswar aside. "Where did you get this bride, Brajeswar?" asked she.

" It is no new bride, mother " answered he.

" And where, my son " asked she with a tear in her eye, " did you find again the lost treasure ? "

" He who gives all things has given her back to me," answered Brajeswar. " Do not speak about the matter to father just now. I intend seeing him when he is in private; and then I shall disclose every thing to him. "

"Not you my son," said she "leave it to me. Let the *Pakasparsa* be over. Till then let all this remain a secret between us."

Brajeswar agreed. The *Pakasparsa* was celebrated without much eclat. And then the *Ginny* sought her lord at a fitting hour and spoke to hm.

"This is no new bride" said she. "It is our first daughter-in-law."

Haravallav started as if shot through by an arrow.

"No! who says so ?" said he in great agitation. "I say so" said the *Ginny*, "I recognized her at once. Braja has also spoken to me. It is she."

"She died ten years ago" retorted Haraballav contemptuously.

"She did not" replied his wife, "the dead do not return to life."

"Where then were she all these ten years ? What life had she led ?" enquired Haraballav.

"I did not enquire" said the Ginny "and I do not mean to enquire. It is enough for me, and it ought to be enough for you that Braja has thought it proper to bring her home. He is not a boy; he is as good a judge of right and wrong as you or I; and it is him that this matter concerns more. We can rely on him."

"I must enquire" said Haraballabh sullenly.

"No, do not," said the *Ginny* with a firmness which Haraballabh had rarely witnessed in her, "Have nothing to say in the matter. You once had your way about her, and the result was, that I was about to lose my only child. Have nothing to say about her again. I shall take poison if you do."

Haraballabh felt crushed. He had no answer to such an argument as this. There was no mistaking in the earnestness with which it was put forward. Brajeswar was Haraballabh's only child, too, and he loved him better than he loved anything else. He gave in.

"Have your way in this matter," said he, "but manage prudently."

They never returned to the subject again. The *Ginny* in due time informed Brajeswar of the result of her conversation with her

husband, and Brajeswar communicated it to Prafulla. There the matter ended to the satisfaction of all parties.

The *Ginny* did well this time. Her triumph was due to her love for her son, and to the rectitude of her conduct.

CHAPTER....

Prafulla wished to see Sagar. She spoke to Brajeswar; Brajeswar spoke to Brahma Thakurani, and Brahma Thakurani to the *Ginny*. So messangers went to fetch Sagar.

Sagar learnt from them that her husband has married again—a big woman with radiant countenance, the like of which had never been seen. The description reminded her of Devi, but it never entered her mind that Devi Rani had come back home to live with her husband. Sagar felt a sort of contempt for her husband. "What can have happened to him that he should think of marrying a big woman?" thought she. She was angry with him. "Marry again? Twice he has gone though the ceremony—is that not enough? Are we not his wives?" She repined at her own lot. "Why, was I not born a poor man's daughter? I might then have lived always near him. He would never have married again, if I had lived near him."

It was in this frame of mind that Sagar reached her husband's home. She made straight for Nayan Bahu. She hated Nayan Tara and Nayan Tara hated her, each in her own way. But under this their common affliction, it was from her alone that she expected any sympathy. Now Nayan Tara had been roaring and hissing like a pent up Cobra ever since Prafulla set her foot in the house. Her husband had seen her but once since his return; he had beat a precipitate retreat before the smart fire of her tongue, and had never ventured again into her presence. Prafulla had come to her, hoping to make her a friend; she might as well have hoped to cultivate amiable relation with a hyæna or a bear. Even her attendants and friends thought proper to keep at a distance at this time of excitement. She had a number of children, who were the greatest sufferers of all. They found that the advent of the new step-mother had made an extraordinary addition to the daily allowance of slaps and blows which they were

accustomed to receive from their amiable mother as tokens of her affection.

Sagar approached the bear who sat sullen in her den.

"Come," said Nayan Tara on seeing, "why should you lag behind? Is there any one else who wants to torment Nayan Tara? Bring her too. The time is come for worrying her to death."

This speech did not hold out much promise of the sympathy which Sagar had hoped for. Nevertheless Sagar sought of her the information she was in need of.

"Then it is true that he has married again!"

"Married?" replied Nayan Tara contemptuously, "I cannot tell you if there has been a marriage. He has brought home a big woman. That is all I know!"

"Hush" said Sagar, tenderly sensitive on the subject of her husband's character, "do not speak in that strain."

"Can I speak in any other way of so big a bride?"

"How old is she?" asked Sagar wonderingly, "I presume as old as I, or even you."

"She may be of your mother's age," said Nayan Tara, "some say she is about fifty."

"Hair grey?" asked Sagar, delighted at this description of the new rival.

"Evidently" said Nayan Tara, "or she would not persistently keep her head covered. (With Hindu female this is a sign of modesty.)

"Teeth gone, I suppose?" suggested Sagar.

"The teeth go when the hairs grow grey—the thing is so plain, I wonder you ask!"

"She must be very much older than our husband?" said Sagar.

"Is she not?" replied Nayan Tara, "what have I been telling you all this while?"

"That cannot be" protested Sagar (according to the Hindu Sastras the wife ought to be younger than the husband).

"It often is the case in Kulin households" maintained her rival.

" She is very handsome, I hear."

"Handsome truly ! " exclaimed Nayan Tara with great indigination, " a pale bloated frightful thing. "

" And had you nothing to say to him who made this extraordinary choice ? " asked Sagar.

" Say ? You will see, if I can get hold of him " replied Nayan Tara.

" I must have a look at this specimen of youth and beauty, " said Sagar, fully prepared to see a most grotesque being.

Sagar found Prafulla on the steps leading to the tank situated within the premises. She found her seated on the steps, scouring some utensils of brass used in the kitchen. She was seated with her back towards the direction from which Sagar was coming. Somebody told Sagar that this was the new *Bahu*. Sagar approached and accosted her.

" Are you our new sister ? " Prafulla turned round " Is it you sister Sagar ? " said she.

Sagar was thunderstruck. The last person she expected to see in the new rival was the very person she saw.

" Devi Rani ! " she exclaimed in amazement. " Hush " replied Devi Rani, " Devi Rani is dead. Come to my apartment and I will explain all. This is not the place. "

The two then left, each entwining the other's neck with her arm. They conversed in private for a long while, till all was explained Sagar was delighted. Sagar could never think of Debi as a rival. " But " said Sagar, " do you believe that this domestic life will suit you? After your throne of silver and diadem of gold, does this scoring of kitchen utensils suit you? Will the thorough adept in Yoga-Philosophy patiently listen to Brahma Thakurani's lectures on the art of frying fish ? Will the lady who commanded hosts submit to the dictation of foolish men and silly crones ? "

" I have come here, " said Prafulla " because I think that *this* life will suit me better than the other. *This* is the woman's proper sphere—woman was not made to reign. And this discipline—that which has to be acquired within the four walls of the family dwelling

house, is the highest and severest of all discipline. Here you have to deal every day with a number of illiterate, often selfish, generally ignorant people; and it has to be made your object that you shall to the best of your ability, promote their happiness and welfare, very often in spite of themselves. And you have to do it, when you yourself are a subordinate and not the ruler; when you have not the power to dispose of things in your own way—where you must expect every effort of yours for good opposed, thwarted and often overruled. And it is only by inexhaustible patience, unflinching self-sacrifice and only through passionate love of good that you can properly fulfil your destiny in the domestic life. It is much easier to rule a kingdom. It is much easier to give up the world, and to lead an ascetic life. True asceticism, true devotion to him who has commanded us to act only for others and not for ourselves can be found only here, the station most difficult fitly to occupy. The grandest life, or the loftiest sphere is not that in which there is the most show and ostentation, but that which calls for the exercise of your highest gifts. I am ambitious, sister, of the highest station woman can occupy—that of the wife and the mother, and therefore I am here."

"Let me see," said Sagar, "how you fulfil this lofty destiny."

It was the case of common sense striving to comprehend transcendent Genius.

Sagar, who had undertaken to watch her success, was so fascinated by it, that she now lived very frequently at her husband's house, often disobeying the commands of her parents to come and live with them. Prafulla found in her a most useful assistant.

If Prafulla ever had a quarrel, it was with Brajeswar. She felt it to be wrong that he should give all his love to her, and should have nothing but courtesy and kindness for Sagar and Nayan Tara. "Unless you learn to love them as you love me, I will not admit that you love me fully. For I have learnt to feel that they and I form one and the same being. What is painful to them is painful to me." These lectures however had little effect; everything else happened as she wished to happen—so marvellous was the influence of unswerving love for all, guided by high and serene intelligence; of the culture which the great Doctrine of 'Niskam Dharma' had imparted to her. Here was the abnegation of self—the asceticism which the Bhagabat Gita had taught her. She sought, not happiness, for that was what pertained to self—but work, which meant with her, work for others. And to the accomplishment of that work she brought an intelligence superb by nature, but improved by the highest culture. Bhavani Thakur had sought to fashion the true steel into a perfect weapon. A perfect weapon it now was—but alas for Bhavani Thakur! it did quite other and far nobler work than that for which he had intended it.

And of that great culture—theoretical and practical—none in Bhutnath ever knew. Few could ever divine that Prafulla could even read and write,—so little are the externals of knowledge necessary to the performance of our highest functions in life. True culture like solid gold, has no sound to give forth. Book-knowledge like hollow brass, resounds magnificently.

And now full of years, wealth and happiness Haraballabh breathed his last. The property devolved on Brajeswar of course. Sagar's father too died in the course of time. His wife refused to survive him. This world she said would be to her an intolerable solitude now that he was taken away. She had no son; she declined to stand longer

in the way of Sagar's happiness by keeping her separated from her husband; and she declined to live in dreary solitude of the sonless widow's life. So she sacrificed herself on her husband's funeral pyre. This brought Brajeswar an immense accession of property. Wealth rapidly multiplied itself under his careful management, guided by the genius of his wife, so much so that Prafulla now reminded her husband of the *loan*.

"What loan ?" asked her husband in surprise.

"The fifty thousand rupees I lent you on board my vessel fifteen years ago. You can now afford to repay it. It is very small to you now ?"

"Gladly" answered her husband. "But what do you want to do with the money ?"

"It is not time," said she, "it must be paid back to the owner."

"Who I remember" said Brajeswar, "is Krishna himself, I remember too your advice how to remit to him."

"The interest has to be paid," suggested his wife.

"Say it has doubled the principal" answered Brajeswar.

"Krishna is not avaricious." said his wife, "but surely seeing that he has given you so much wealth and prosperity—".

"Krishna's agents are very grasping, I see," said Brajeswar laughingly, "will two hundred thousand content him ?"

"I will be satisfied with it at present" said Prafulla. "Now how do you propose to remit the money ?"

"In a rather convenient way" answered the husband, "I will found an asylum for the destitute, and endow it."

"That will do," answered the wife.

Brajeswar built an asylum for the destitute, endowed it, placed an image of the Goddess of Plenty there, and called it '*Devi-Niketan*' —that is, the abode of the goddess (Devi) of Plenty.

Devi had now many children whom she brought up with special care. To the boys she taught truth, manliness, courage—pretty much after the fashion Bhavani Pathak had followed in her case. To the girls she imparted the faminine culture which had been hers by nature

and which had been improved by the refining influence of her great love of the Pure and Holy.

And then full of years and happiness, at a ripe old age, Debi closed this life for a still nobler one—mourned by all as the "good and pious mother of all."

I have only a word to add regarding Bhavani Pathak. Now that the British Government had settled the country and stamped out crime, Bhavani's occupation was gone. He had no more wrongs to redress; the law had asserted itself and resumed its function. So he dispersed his men and betook to literature and philosophy. And pondering deeply on his past life in the seclusion and enforced idleness to which he found himself condemned, he found serious reasons to doubt whether he had moved in the right path. The doubts became stronger and stronger as he meditated on the purity of Him, whose nature the great system of philosophy of which he was such a master sought to expound. At last he was convinced. He had gone wrong. An atonement was needed to expiate his crimes. So he went and delivered himself up to the authorities. As no crime then capitally punishable was proved against him he was sentenced to transportation; he sailed cheerfully across the Sea and ended his days in banishment.